৪২বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
পুরনো সংখ্যা থেকে		২
দশাবতার ভাষ্য	অনুঃ আশীষ লাহিড়ী	৩
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	সমীরকুমার ঘোষ	৬
স্বচিকিৎসা (৭)	গৌতম মিস্ত্রী	১১
যৌনকর্মীদের মর্যাদা	বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৪
ব্যতিক্রমী বিবাহ পদ্ধতি	পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
শ্রীলঙ্কা জৈব কৃষি পদ্ধতি	সুশান্ত মজুমদার	১৭
ছোটদের ওপর খবরদারি	অরুণালোক ভট্টাচার্য	২০
নারায়ণচন্দ্র রানা	ষড়ানন পণ্ডা	২২
সাগরদ্বীপে মন্দির	দীপকরঞ্জন মণ্ডল	২৫
ডাইনি সমস্যা	পূর্ণিমা সাহা	২৮
পুস্তক পর্যালোচনা		৩০
প্রতিবেদন		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট : www.utsomanush.com/ই - মেল: utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

নবজাগরণের পুরোধা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), রবীন্দ্রনাথ যাঁকে **ভারতপথিক** আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁর জন্মের ২৫০ বছর পূর্তিতে উৎস মানুষ আধুনিক ভারতের রূপকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। শুধু সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই নয় আজও রামমোহনের চিন্তা-ভাবনা কতটা প্রাসঙ্গিক তা আমাদের চারপাশের ঘটে চলা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক কুসংস্কারের রমরমা দেখলেই বোঝা যায়। আগামী সংখ্যায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হবে।

হঠাৎ করে পুজোর ধুম পড়ে গেছে। প্রায় মাস দুয়েক ধরে 'শীতলা মাতা'; মাঝে 'লোকনাথবাবা'কে নিয়ে চললো। এত ভ্যাকসিন এত প্রচার তবুও 'মায়ের দয়া' আটকাতে শীতলা মাতাকে ডাকতে হচ্ছে। আর লোকনাথবাবার মন্দির তো আনাচে-কানাচে। এসব নিম্নবিত্ত এলাকায় বেশি চোখে পড়ে। পুজো উপলক্ষে রাস্তা-জোড়া প্যান্ডেল, মাইকের গর্জন— এ যেন বারোমাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোটের অঙ্ক কষে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই আয়োজকদের ঘাঁটায় না।

খবরে প্রকাশ কলকাতা পুর এলাকায় তরল বর্জ্য শোধনের জন্য সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট-এর সংখ্যা মোট পাঁচটি। সেগুলির সম্মিলিত শোধন ক্ষমতা যা তার চেয়ে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির শোধন ক্ষমতা ঢের বেশি। আর সেটি হয় প্রাকৃতিক উপায়ে। তার জন্য আলাদা কোনো খরচ নেই। অথচ জমি-মাফিয়াদের দাপটে সেই জলাভূমি লুট হয়ে যাচ্ছে। এই লুট ঠেকাবে কে?

উন্নয়নের দোহাই দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক সঙ্কট, পূর্ব-আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এবং বিভিন্ন দেশে বন্যা মানুষকে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিশ্ব-উষ্ণায়ন-এর জেরে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে এসেছে। ওসব সরকার দেখবে, আমাদের আর কিই-বা করার আছে এই মনোভাব পরিস্থিতিকে আরো সঙ্কটজনক করে তুলছে। প্রয়োজন সার্বিক সচেতনতা, যা মানুষকে মানুষের মতো বাঁচার পথ দেখাতে পারে।

করোনা সংক্রমণ পৃথিবীর প্রতিটি দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু

করে দিয়েছে, আমাদের দেশে এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুতর। কবে আমরা সুস্থ পরিবেশে ফিরে যেতে পারব তা অজানা।

অতিমারীর কারণে গত দু'বছর স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা যায়নি। আগামী ১৯ নভেম্বর ২০২২ দ্বাদশ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। বক্তা হিসেবে থাকবেন প্রখ্যাত সাংবাদিক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি উৎস মানুষ পত্রিকার পুরোনো বন্ধু। প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন গুণগ্রাহীও বটে।

—সম্পাদকমণ্ডলী

উমা

দ্বাদশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

১৯ নভেম্বর (শনিবার)
বিকেল ৫টায়
বিষয় ঃ
বিজ্ঞান আর কুসংস্কার, দুই-ই যখন মুনাফা উৎপাদনের কাঁচামাল
বক্তা —
মাননীয় অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়
স্থান—
মহাবোধি সোসাইটি হল
৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
প্রবেশ অবাধ

মানুষ (উৎস মানুষ) পত্রিকার পুরনো সংখ্যা থেকে —

কেমন ছিল সংখ্যাগুলি? তারই কিছু নমুনা তুলে ধরা হবে মূলত নতুন পাঠকদের কথা ভেবে। প্রথম বছরে (১৯৮০) প্রতি মাসে একটি করে বার্ষিক বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হত, পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ও বিনিময় মূল্য থাকত যথাক্রমে ১৮ এবং ০.৭৫ টাকা। প্রথম বছরে পত্রিকা 'মানুষ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকে পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পত্রিকা 'উৎস মানুষ' নামকরণ করা হয়। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার (ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০) **সম্পাদকীয়র** কিছু অংশ:

অন্যচোখে সূর্যগ্রহণ — আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিকেলবেলা সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হবে। ভারত থেকে পূর্ণগ্রহণ দর্শনের এই বিরল সুযোগ আসছে ৮২ বছর পরে। পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞানীরা তৎপর, বৈজ্ঞানিক চোখে সেই সূর্যগ্রহণকে দেখবেন তাঁরা। তা দেখুন, তবে আমরা এখন অন্যচোখে আরেক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণকে দেখি আসুন। ...মহাভারতের দ্রোণপর্ব। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ১৪তম দিন। অর্জুন অভিমন্যুর ঘাতক জয়দ্রথকে বধ করবেন সূর্যাস্তের আগে — ভীষণ শপথ নিয়েছেন। অথচ এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কি হবে? তখন শ্রীকৃষ্ণ মায়াবলে সূর্যকে আড়াল করলেন, অকালসন্ধ্যা নামল। জয়দ্রথ উল্লাসে ব্যূহ ছেড়ে বেরিয়ে এসে নিহত হলেন। অর্জুনের শপথ রক্ষা হ'ল, আর তার কয়েক পল পরেই ফের আকাশে সূর্যকে দেখা গেলো পূর্ণ উজ্জ্বলতায়। ...কেমন করে হল? কৃষ্ণের কৌশলটা কোথায় ছিল? সেটা কি কোন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ঘটনা ছিল, যার দিনক্ষণ পূর্বেই গণনা করেছিলেন কৃষ্ণ, ক'রে অর্জুনকে সেইমতো পরামর্শ দিয়েছিলেন? যা সমাগত জনের প্রায় সবারই অজানা, তা কেবল কৃষ্ণের পক্ষে জানা খুবই সম্ভব ছিল, কেননা মেধায় বিদ্যায় প্রজ্ঞায় বাসুদেবকে পুরুষশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মহাভারতের সবচেয়ে রহস্যময় পুরুষ এই কৃষ্ণ, অসাধারণ গুণসম্পন্ন। অবন্তীনগরে (বর্তমানে আমেদাবাদ) ৬৪ কলা অধ্যয়ন ক'রে চূড়ান্ত পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন তিনি। ভাগবতের ১০ম স্কন্দের ৪৫ অধ্যায়ে কিংবা শুক্রনীতি গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এই ৬৪কলার বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে। নৃত্য, গীত, রন্ধন, যুদ্ধ, ধাতুবিদ্যা, অভিধানবিদ্যা, বৈনয়িকীবিদ্যা — সবেতেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। .....

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার (ফেব্রুয়ারী ১৯৮০) থেকেই শুরু হয়েছিল একটি ধারাবাহিক লেখা — *প্রমিথিউসের পথে - নব্যচিন্তার বিদ্রোহী নায়কেরা* — প্রথম লেখায় প্রমিথিউস চার্বাক বিদ্যাসাগর কোপার্নিকাস। এই সংখ্যাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর লিখেছিলেন — 'হাঁস আর দুধ জলের রহস্য'— ব্যাখ্যা করেছেন এই রহস্যের।

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার (মার্চ ১৯৮০) সূচিপত্র — জাতিস্মরতা ও জন্মান্তরবাদ। বৈজ্ঞানিক সমর্থন কোথায়? এ কি কোন উদ্দেশ্যমূলক প্রচার?

স্বপ্ন কি? কেন দেখি? স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়?

পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বিজ্ঞানী ব্রুনোকে।

সাপ নিয়ে গালগল্প। এই সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছিল *সাপ নিয়ে কিংবদন্তী* সিরিজ, যা পরবর্তী পর্যায়ে সংকলিত হয়ে জনপ্রিয় বই হিসেবে প্রকাশিত হয়।

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যার (এপ্রিল ১৯৮০) সূচিপত্র — গড আল্লা ভগবান এবং অন্ধবিশ্বাস/ ভর হওয়া কি হিস্টিরয়া/সাপ নিয়ে কিংবদন্তি / পাষাণী অহল্যার রহস্য /আসামির কাঠগড়ায় সত্যানুসন্ধানী গ্যালিলিও।

উমা

দশাবতার ভাষ্য (দ্বিতীয় ভাগ)

মৎস্য আর শঙ্খাসুর [নামক রাক্ষস] প্রসঙ্গে

আশীষ লাহিড়ী

ধোন্দিবা: আচ্ছা, বামনের আগে কতগুলি আর্য সেনাদল ইরান থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল?

জোতীরাও: সমুদ্রপথে তাদের অনেকগুলি দলই ভারতে ঢুকেছিল।

ধোন্দিবা: প্রথম সেনাদলটি কি জাহাজে করে এসেছিল?

জোতীরাও: তখন তো তাদের যুদ্ধজাহাজ ছিল না। তারা এসেছিল ছোটো ছোটো শালতি বা ডোঙায় (ক্যানু) করে। ওগুলো সমুদ্রে খুব দ্রুত চলতে পারে। খুব সম্ভব সেই কারণেই ওই দলের সর্দারকে 'মৎস্য' বলা হত।

ধোন্দিবা: কিন্তু তাহলে ব্রাহ্মণ ইতিহাসবিদরা তাদের *ভাগবত পুরাণ* প্রমুখ বইতে কেন লিখল যে ওই সর্দারের জন্ম হয়েছিল মৎস্যের গর্ভে?

জোতীরাও: নিজেই ভেবে দেখ। মাছের সঙ্গে মানুষের কোনো সাদৃশ্য কি দেখতে পাও? উভয়ের শারীরিক গঠন, খাদ্য, ঘুম, যৌন এবং প্রজনন সংক্রান্ত অভ্যাসাদি সবই একেবারে আলাদা। শুধু তাই নয়, উভয়ের মস্তিষ্ক, যকৃৎ, ফুসফুস, অন্ত্র, গর্ভ এবং যৌনাঙ্গগুলি সবই একেবারে আলাদা। মানুষ থাকে ডাঙায়। সে জলের মধ্যে বাঁচতে পারে না, সহজেই জলে ডুবে মরে যায়। আবার মাছেরা কেবল জলেই বাঁচে। তারা জল ছাড়া বাঁচে না। নারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একবারে এক সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু মাছ-মায়েরা একবারে অনেকগুলো ডিম পেড়ে সেগুলোকে তা দিয়ে ফোটায়। এবার ধরো যদি ওইসব ডিমের মধ্যে কোনোটিতে মানুষের বাচ্চা থাকে, এবং মাছ-মা সেই ডিমটিকে ডাঙায় তুলে এনে ফোটায় এবং সেই ডিম থেকে একটি মানুষের ছানা নির্গত হতে দেয়, তাহলে প্রশ্ন: মাছ-মা জলের বাইরে বাঁচল কী করে? কিংবা ধরো সে জলের মধ্যেই ডিমটা ফোটাল; সেক্ষেত্রে প্রশ্ন: মানুষের ছানাটি জলের মধ্যে বাঁচল কী করে? কিংবা এরকম যদি ধরে নেওয়া যায় যে একজন কোনো ওস্তাদ মানুষ-ডুবুরি মানুষ-মাছের ছানাওয়ালা ডিমটাকে চিনতে পেরে জলে ডুব দিয়ে সেটাকে তুলে আনল, যাতে করে ছানাটা ডিম ফুটে বেরিয়ে আসতে পারে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক তাই ঘটল। তাহলে প্রশ্ন: কে সেই চালাক মানুষ যে কিনা মাছের ডিমের ভেতর থেকে মানুষের ছানা টেনে বার করতে পারে? এ তো সাংঘাতিক কৃতিত্বের পরিচয়! আজ বিজ্ঞান আর চিকিৎসাশাস্ত্রে অগাধ উন্নতি হয়েছে; ইউরোপ আর আমেরিকায় চিকিৎসাশাস্ত্রের অতি অসাধারণ সব বিশেষজ্ঞের উদয় হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনো ডাক্তার, তিনি যত বড়ো বিশেষজ্ঞই হোন, তিনি কি সাহস করে বলতে পারবেন যে মাছের ডিমকে জল থেকে ডাঙায় তুলে এনে তা থেকে একটা জ্যান্ত মাছের ছানা বার করতে পারবেন? যাকগে এ প্রসঙ্গ। কোন্ অমর মৎস্য জল থেকে উঠে এসে মানুষ ডুবুরিকে সেই বিশেষ ডিমটি কোথায় আছে তা জানাল? ডুবুরি কী করে সেই মেছো ভাষা বুঝল? ভাগবত পুরাণে এইসমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমরা পাই না। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে পরবর্তী কালে সেই একই ধূর্ত ব্রাহ্মণরা কায়দা করে এই সন্দেহজনক মেছো অতিকথাটিকে প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে।

ধোন্দিবা: বেশ। সেই সর্দার তার দলবল নিয়ে জাহাজ থেকে ঠিক কোথায় নামল?

জোতীরাও: পশ্চিমের সাগর পাড়ি দিয়ে সে পশ্চিমকূলের কোনো বন্দরে এসে নামল।

ধোন্দিবা: মাছটা তারপর কী করল?

জোতীরাও: সেই মাছটা শঙ্খাসুর নামে এক সর্দারকে মেরে তার রাজ্য দখল করল। মাছটা যতদিন বেঁচে রইল ততদিন আর্যরা রাজ্য শাসন করল। মাছ মরবার পর শঙ্খাসুরের লোকেরা মাছের দলবলের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল।

ধোন্দিবা: সে-আক্রমণের ফল কি হল?

জোতীরাও: মাছের দল সে-আক্রমণে হেরে গিয়ে চম্পট দিল। কিন্তু শঙ্খাসুরের লোকেরা তাদের পিছনে নাছোড়বান্দার মতো লেগেই রইল। ফলে মাছের দলবল পাহাড়ে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হল। আর ঠিক সেই সময় জাহাজে করে ইরান থেকে আর একদল আর্য এসে ওই বন্দরে নামল। এই নৌকোগুলো ছিল শালতি কিংবা ক্যানুর চেয়ে আকারে অনেক বড়ো, আর সেই কারণে কচ্ছপের মতো ধীরগামী। তাই ওই নৌকো থেকে যেসব লোক নামল তাদের বলা হল কচ্ছ (কূর্ম), অর্থাৎ কচ্ছপ।

তৃতীয় ভাগ
কচ্ছ (কূর্ম), ভূদেব অথবা ভূপতি, ক্ষত্রিয়, দ্বিজ[১] এবং রাজা কশ্যপ

ধোন্দিবা: সব দিক ভেবে দেখলে, মাছে আর কচ্ছপে কিছু তফাত থাকলেও বেশ কিছু মিলও আছে। যেমন, উভয়েই জলের প্রাণী, উভয়েই ডিম পাড়ে, উভয়েই ডিম ফুটিয়ে ভিতর থেকে প্রাণগুলিকে বার করে দেয়। তাই ইতিহাসবিদরা তাদের *ভাগবত* প্রমুখ বইতে লিখেছে, কূর্ম অবতারের জন্ম হয়েছিল কচ্ছপ থেকে। কিন্তু এই যুক্তিধারা অনুসরণ করে যদি এগোই, তাহলে দেখব, ঠিক মৎস্য অবতারেরই মতন একটি মেছো গপ্পে এসে পৌঁছেছি — এই যে-গপ্পটা আমরা এতক্ষণ শুনলাম সময় নষ্ট করার এ এক প্রকৃষ্ট পন্থা। তাই আমি আপনাকে এর পরের প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছি। বন্দরে নামবার পর এই কচ্ছ কী করল?

জোতীরাও: পাহাড়টা বন্দরের কাছেই। তাই প্রথমেই সে যেসব লোক মৎস্যর দলবলকে পাহাড়ে আটক করে রেখেছিল, তাদের দূর করল। আর সেই সঙ্গে সেখানকার আদি বাসিন্দাদেরও। এইভাবে নিজের দেশের লোকজনকে উদ্ধার করে সে নিজেই ওখানকার রাজা হয়ে বসল। রাজা মানে ভূপতি। আপামর লোকের ওপর তার ক্ষমতা জারি করল।

ধোন্দিবা: বুঝলাম। কিন্তু কূর্ম যেসমস্ত ক্ষত্রিয়কে দূর করল তারা গেল কোথায়?

জোতীরাও: তারা সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। আরও একদল ইরানিকে আসতে দেখে তারা 'দ্বিজরা এসে গেছে রে' এই আওয়াজ তুলে নিজেদের নেতার পথ অনুসরণ করে পাহাড়ের অন্য দিকে সরে গেল। সেই নেতার নাম কশ্যপ। কচ্ছ তখন তার সেনাবাহিনী নিয়ে ওদের তাড়া করে পিছন দিকের পাহাড়ে নেমে এল। এদিকে ইরান থেকে আরও দলে দলে সৈন্য আসতেই লাগল। ফলে কচ্ছও কশ্যপের দলকে ক্রমাগত হয়রাণ করে চলল। পরে কশ্যপ কচ্ছর কাছ থেকে পাহাড়টা আবার দখল করে নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু সবই বৃথা। কচ্ছ তার দখল-করা অঞ্চলের সূচ্যগ্র মেদিনীও ছাড়ল না। মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়েনি।

১। দ্বিজ বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন বর্ণকেই বোঝাত। ফুলে কিন্তু এখানে শুধু ব্রাহ্মণদের কথাই বলছেন।

চতুর্থ ভাগ
বরাহ আর হিরণ্যাক্ষ

ধোন্দিবা : কচ্ছ মরার পর কে রাজা হল?

জোতীরাও: বরাহ।

ধোন্দিবা: *ভগবদ্‌গীতার* লেখক প্রমুখ ইতিহাসকারা লিখেছেন, বরাহ শুয়োরের সন্তান। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

জোতীরাও: আসলে একটু ভাবনাচিন্তা করলেই তৎক্ষণাৎ আমরা বুঝতে পারব মানুষ আর শুয়োর পরস্পরের থেকে একেবারেই আলাদা। তবু, এ বিষয়ে তোমার মনে পূর্ণ প্রত্যয় জাগানোর জন্য আমি তোমাকে কেবল একটা উদাহরণ দেব। সন্তান জন্মের পর মানবী আর শূকরী সেই সন্তানের সঙ্গে কেমন আচরণ করে সেটা ভাবো। সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর থেকেই মানবী তার দেখাশোনা করতে শুরু করে দেয়, সম্ভাব্য সবরকম বিপদআপদের হাত থেকে তাকে আগলে রাখে। আর শূকরী মাতা, ঠিক কুক্কুরী-মাতার মতোই, তার প্রথম-জাত সন্তানটিকে খেয়ে ফেলে এবং তারপর অন্যান্য ছানাগুলির জন্ম দেয়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে বরাহর জন্ম দেওয়ার আগে তার শূকরী-মাতা পূর্বজ ছানাটিকে গলাধঃকরণ করেছিল; সেই ছানাটি ছিল শূকর প্রজাতির; তাকে খেয়ে ফেলার পরে সেই শূকরী-মাতা এই শূকরমানব প্রজাতির ছানাটির জন্ম দিয়েছিল। অথচ *ভগবদ্‌গীতার* লেখকরা জানাচ্ছেন, এই বরাহ হল স্বয়ং সর্বশক্তিমান আদি ঈশ্বরের অবতার, খোদ আদি নারায়ণের অবতার। তাই যদি হয়, তাহলে এটা কি তাঁর দিব্যজ্ঞানের, তাঁর সর্বময় দৃষ্টির, তাঁর সুবিচার ও ন্যায়বোধের গায়ে কলঙ্ক লেপন করে না? বরাহর কি উচিত ছিল না তার মা যাতে তাঁর প্রথম-জাত সন্তানটিকে, অর্থাৎ বরাহর বড়দাকে, বেমালুম গিলে ফেলতে না-পারে তার ব্যবস্থা করা? ভগবান নিজে এত বড়ো একটা ভুল করে বসলেন এ বড়োই পরিতাপের বিষয়। এই যে শূকরী, যিনি কিনা বরাহর মা, তাঁর নাম ছিল পদ্মা। এবং তিনি শিশুহত্যার অপরাধ করেছিলেন। হ্যাঁ, নিজের শিশুকে হত্যা করা, তা সে যে-প্রজাতিরই হোক, সেটা কিন্তু শিশুহত্যারই অপরাধ। আর শুধু কি খুন? তিনি তো তাঁর নিজের সন্তানকে একেবারে কোঁৎ করে গিলে ফেলেছিলেন! কোনো অভিধানে এমন কোনো শব্দ নেই যা দিয়ে এই কাজের বীভৎসতাকে প্রকাশ করা সম্ভব। এই মাকে কি ডাকিনী বলা চলে? কিন্তু একটা প্রবচন অনুযায়ী এমনকী ডাকিনী-মাও

কখনো আপন সন্তানকে ভক্ষণ করে না। তাছাড়া, এমন ভয়ংকর একখানা পাপের সাজা স্বরূপ নরকের অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্যে তিনি যে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন, তারও কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। এটা ভাবলে সত্যিই আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

ধোন্দিবা: আচ্ছা, বরাহর শূকরী-মার নাম যদি হয় লক্ষ্মী, তাহলে তাঁর স্বামীরও নিশ্চয়ই একটা নাম ছিল?

জোতীরাও: হ্যাঁ, তা তো ছিলই — তাঁর নাম ছিল ব্রহ্মা!

ধোন্দিবা: তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, সেই আদ্যিকালে জন্তুজানোয়াররা নিজেদের নানা নামে ডাকত, যথা ব্রহ্মা, নারদ, আর মনু! কিন্তু প্রশ্ন, এইসব ধাপ্পাবাজ ইতিহাসবিদরা কী করে সেইসব নামের খবর পেল? দ্বিতীয়ত, পদ্মা নামের এই শূকরীটি নিশ্চয়ই বরাহকে বুকের দুধ খাইয়েছিল? কিন্তু তার স্বামী ব্রহ্মার পিছু পিছু বরাহকে গ্রামের অলিগলি দিয়ে ঘুরঘুর করতে করতে নরম অঙ্কুর আর গাছপালার ওপর দিয়ে চরে বেড়াতে শেখাল কে? বোধহয় স্বয়ং ঈশ্বর। খোদ আদিনারায়ণ ছাড়া আর কেউ এসবের ব্যাখ্যা দিতে পারবে না! সংক্ষেপে, এঁদের লেখা বইপত্রে এসব ব্যাপারের কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ মেলে না। আর যেহেতু মেলে না, তাই আমি এইসমস্ত লেখাপত্রকেই সন্দেহ করি; বরাহর জন্ম হয়েছিল শুয়োরের পেট থেকে, এসব কথা একেবারে গাঁজাগল্প। এইসব কথা লিখতে লেখকের কি এতটুকু লজ্জা করল না?

জোতীরাও: সাবাস! কিন্তু তোমরাই-বা কম কীসে? ওরা, ওদের ছেলেমেয়েরা, যে-জলে পা ধোয়, তোমরা কী করে সে-জল পান করো? তাহলে কে বেশি নির্লজ্জ? ওরা, না তোমরা?

ধোন্দিবা: আচ্ছা, আচ্ছা, মেনে নিলাম। কিন্তু বরাহ নামটা কোথা থেকে এল বলে আপনার মনে হয়?

জোতীরাও: হয়তো এর কারণ, লোকটার স্বভাবচরিত্র, আচারব্যবহার ঠিক শুয়োরের মতোই বিরক্তিকর! সে যেখানেই যেত, লণ্ডভণ্ড করে দিত। শুয়োরেরই মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তেড়ে গিয়ে জয় ছিনিয়ে আনত। হয়তো তার প্রতি নিজেদের অশ্রদ্ধা জানাবার জন্য ক্ষত্রিয়রাই এই হাস্যকর 'বরাহ' নামটা দিয়েছিল। হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপুর মতো বীর যোদ্ধাদের এলাকাতেই তো থাকত ক্ষত্রিয়রা। আর এরই ফলে নিশ্চয়ই ওর মেজাজ গিয়েছিল খিঁচড়ে। শোধ নেবার জন্য ও নিশ্চয়ই বারবার হানা দিয়েছিল ক্ষত্রিয়দের এলাকায়, হয়রান করেছিল সেখানকার বাসিন্দাদের। ওই রকমই একটা কোনো যুদ্ধে ও হিরণ্যাক্ষকে মেরে ফেলে। তখন ভয়ে পৃথিবীর (হিন্দুস্তানের) ক্ষত্রিয় সর্দারদের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুকাল তারা ছন্নছাড়া হয়ে কাটায়। তারপর অবশেষে একদিন বরাহ শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। সে মরল।

পঞ্চম ভাগ

নরসিংহ, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, বিপ্র

ধোন্দিবা: বরাহর পর বিপ্রদের রাজা হল কে?

জোতীরাও: নৃসিংহ।

ধোন্দিবা: তার স্বভাবচরিত্র কেমন ছিল?

জোতীরাও: নৃসিংহ ছিল অত্যন্ত লোভী, ধূর্ত, ধাপ্পাবাজ, বিশ্বাসঘাতক, কূটকচালে, নিষ্ঠুর আর নির্দয়। তার চেহারা ছিল সুগঠিত আর দশাসই।

ধোন্দিবা: সে কী করল?

জোতীরাও: প্রথমেই সে হিরণ্যকশিপুকে মারবার ফন্দি আঁটল। সে ভালো করেই জানত যে হিরণ্যকশিপুকে খুন করতে না পারলে সে হিরণ্যকশিপুর রাজ্য দখল করতে পারবে না। এই ধান্দা চরিতার্থ করবার জন্য সে খুব সাবধানে ফন্দি আঁটল। তার এক দ্বিজ শিক্ষককে সে একাজে লাগাল। এই শিক্ষকটি হিরণ্যকশিপুর শিশুপুত্র প্রহ্লাদের কচি মনের মধ্যে নিজের ধর্মের নীতিগুলো ঢুকিয়ে দিল। তারপর থেকে প্রহ্লাদ বেঁকে বসল, সে আর তাদের পারিবারিক দেবতা হরহরকে পুজো করতে রাজি হল না। কারণ নৃসিংহ ভিতর থেকে প্রহ্লাদকে সাহায্য করে চলছিল। শেষ পর্যন্ত নৃসিংহ তার মিছে কথাগুলো দিয়ে প্রহ্লাদের মনকে এমনই বিষিয়ে তুলল যে তার বাবাকে খুন করতেও রাজি হয়ে গেল। কিন্তু এই জঘন্য কাজটি করবার জন্য সে যথেষ্ট সাহস অর্জন করতে পারল না। তাই নৃসিংহ করল কী, ঠিক সময় বুঝে নিজেকে সিংহর সাজে সাজাল, মুসলমানরা যেমন মহরম উৎসবের সময় নিজেদের বাঘ সাজায়, তেমনি। সে ভয়ংকর কতকগুলো দাঁত মুখের ভেতরে পরে নিল, আর মুখের চারপাশ ঘিরে লাগাল নকল কেশর। এইভাবে সে নিজেকে সিংহ সাজাল। তারপর সে সারা শরীরে সূক্ষ্ম মলমলের একখানা শাড়ি জড়িয়ে তার আঁচল দিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে মুখ আড়াল করল। এবার প্রহ্লাদের সাহয্য নিয়ে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের ঢঙে পা টিপে টিপে হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদে ঢুকল সে। শোবার ঘরে গিয়ে ঘর সংলগ্ন স্তম্ভগুলোর একটার আড়ালে লুকিয়ে রইল। সারা দিনের প্রচুর প্রশাসনিক কাজকর্ম সেরে ক্লান্ত হিরণ্যকশিপু সন্ধেবেলা শোবার ঘরে এসে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য খাটের ওপর গা এলিয়ে দিলেন। অমনি নৃসিংহ

মাথা থেকে ঘোমটাখানা খুলে গাছকোমর করে বেঁধে নিয়ে তার লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে বিছানায় শোওয়া নিশ্চিন্ত হিরণ্যকশিপুর শরীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আঙুলে-আঁটা বাঘনখগুলো বসিয়ে দিল তাঁর পেটে। চিরে ফালাফালা করল তাঁর শরীরটাকে। এই বীভৎস কর্মটি সমাধা করে অন্যান্য দ্বিজদের সঙ্গে নিয়ে নৃসিংহ চকিতে ফিরে গেল তার নিজের এলাকায়। ক্ষত্রিয়রা যখন জানতে পারল প্রহ্লাদকে ঠকিয়ে কীরকম ছল করে নৃসিংহ এই বীভৎস কাজটি করেছে, তারা আর্যদের দ্বিজ নামে ডাকা বন্ধ করে দিল, তার বদলে দিল *বিপ্রিয়* নাম। পরে ব্রাহ্মণরা যে *বিপ্র* নামে অভিহিত হল, সেটা বোধহয় এই বিপ্রিয় মূল শব্দটারই অপভ্রংশ। পরে ক্ষত্রিয়রা নৃসিংহকে *নারসিংহ*[২] নামে ডাকতে লাগল, যেটা স্পষ্টতই অপমানসূচক। হিরণ্যকশিপুর ছেলেদের মধ্যে অনেকেই অনেক দিন ধরে ওকে সাজা দেওয়ার খুব চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। নারসিংহও হিরণ্যকশিপুর রাজ্য দখল করার আশা ছেড়ে দিল। আর কোনো ঝামেলা না পাকিয়ে সে নিজের জায়গাতেই গ্যাঁট হয়ে বসে রইল, মরার দিন পর্যন্ত নিজেকে সুরক্ষিত রাখাই ছিল তার কাজ।

২। মূল শব্দটা বায়াকো, যার আক্ষরিক অর্থ পত্নী। ফুলে নৃসিংহ অর্থাৎ পুরুষ-সিংহকে স্ত্রীলিঙ্গে নার-সিংহ অর্থাৎ নারী সিংহে রূপ দিয়েছেন। **উমা**

ভারতে পাভলভ-ভগীরথ ধীরেন্দ্রনাথ

সমীরকুমার ঘোষ

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একজন প্রথিতযশা মনোরোগ চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর দৌলতেই এদেশে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সবার পরিচয়। এর বাইরেও তাঁর কর্মকাণ্ড ছড়িয়েছিল বহুক্ষেত্রে। যার অন্যতম হল মনোরোগ নিয়ে সচেতনতা এবং মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী করে তোলা। আমি ঠিক প্রথাগত জীবনী লেখায় অভ্যস্ত নই। একটু অন্যভাবে কারো জীবন ও কাজের কথা লিখতে চাই। এখানেও সেই চেষ্টা করলাম। যেহেতু দীর্ঘদিন ওঁর সাহচর্য পেয়েছি, তাই লিখতে গিয়ে কোথাও কোথাও নিজের কথা এসেছে। সেটা নিজেকে জাহির করতে নয়, ওঁকে বুঝতে বা বোঝাতে। তাই সুধীপাঠক অপরাধ নেবেন না। — লেখক

সলতে পাকানো পর্ব — উনশিশো চল্লিশের দশক সবে শুরু। রুশ-মার্কিন ঠাণ্ডা লড়াই চলেছে জাঁকিয়ে। গোটা বিশ্ব কার্যত দুটো শিবিরে বিভক্ত। এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। এ তো গেল রাজনৈতিক চিত্র। অন্যদিকে মার্কিন বিশ্বেই একচ্ছত্র আধিপত্য অস্ট্রিয়ার চিকিৎসক তথা ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব। লোকে সাইকোঅ্যানালিসিস, সাবকনসাস মাইন্ড মা-ছেলে বা বাবা-মেয়ের প্রভাব নিয়ে শুরু হয়েছে বাংলায় ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে ফ্রয়েড-চর্চা ও ফ্রয়েডীয় মতে সাইকোঅ্যানালিসিস পদ্ধতিতে চিকিৎসা। ডাঃ অজিত দেবও তাতে শরিক। সেই সময়ে একরকম বোমাই ফাটালেন এক ছোটখাটো চেহারার মানুষ — ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বা ধীরেন গাঙ্গুলি। কেউ ছোট করে বলেন ডিজি। তিনি হাজির করলেন পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানকে, যার আশ্রয় ভাববাদ নয়, পুরোদস্তুর বস্তুবাদ। বস্তুবাদে বিশ্বাসী চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করেন, মন কোনো বস্তু নয়, কিন্তু মন বা মানসিকতার অধঃস্তর মস্তিষ্ক একটি বস্তু। মস্তিষ্কের অংশবিশেষের ক্রিয়াকলাপে বিপর্যয় বা বিশৃঙ্খলা ঘটলে মনের রোগ হয়েছে বলে মনে করা হয়। মস্তিষ্ককোষের আপাত-পরীক্ষায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি ধরা পড়ে না। এইসব বিশৃঙ্খলাকে কার্মিক বিশৃঙ্খলা (ফাংশানাল ডিজঅর্ডার) বলা হয়। তবে মস্তিষ্কে টিউমার বা ইনফ্ল্যামেশন হলে বা রোগজীবাণু আক্রমণ করলে মানসিক রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সেটা স্নায়ুরোগের চৌহদ্দিতে পড়ে।

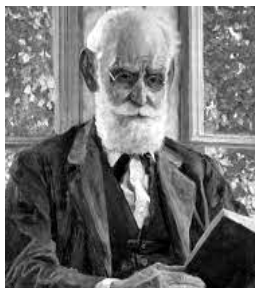

রাশিয়ান বিজ্ঞানী ইভান পেত্রোভিচ পাভলভ চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, পুরস্কার চালু হওয়ার চতুর্থ বছরে, ১৯০৪ সালে। তিনিই প্রথম

ফিজিওলজিতে নোবেল প্রাপক, সেই সঙ্গে প্রথম নোবেলজয়ী রাশিয়ানও। এই পাভলভকে আমরা চিনি স্কুলপাঠ্যের দৌলতে, কুকুর নিয়ে তাঁর পরীক্ষাও কন্ডিশনিং রিফ্লেক্স বা শর্তাধীন পরাবর্ততত্ত্বের জন্য। পাঠকদের এটা নিয়ে দু-একটা কথা মনে করিয়ে দিই। পরিপাকগ্রন্থি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে পাভলভ লক্ষ্য করেন, খাদ্য কাছে আসার অনেক আগেই পরীক্ষাধীন কুকুরের জিভ থেকে লালা ঝরছে। যে খাবার দেয়, তার পায়ের শব্দ শুনলেও লালা ঝরছে। খাদ্য দেখল না, গন্ধ পেল না, তবু কেন কুকুরের লালা পড়ে? এটা জানতেই পাভলভ ব্যাকুল হয়ে পড়েন। খাদ্য মুখে পড়লে লালা ঝরাটা একটা স্বভাবজাত ক্রিয়া। কিন্তু খাদ্য সরবরাহকের পায়ের শব্দে লালা ঝরাটা কোন ধরনের ক্রিয়া? এই চিন্তা থেকে শর্তাধীন পরাবর্তের উৎপত্তি। তিনি বুঝলেন, খাদ্যের রূপ রস গন্ধ ইত্যাদি তার নিজস্ব গুণ ছাড়াও খাদ্যসরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নানাপ্রকার উদ্দীপক, যেমন ঐ পায়ের শব্দ, খাবারের পাত্র ইত্যাদি লালাগ্রন্থিকে উত্তেজিত করতে পারে। এই ধরনের প্রক্রিয়াকে বলা চলে, মানসিক বা আত্মিক প্রক্রিয়া। ইংরেজিতে বললে 'সাইকিক রিঅ্যাকশন'। পাভলভই প্রথম এইসব প্রতিক্রিয়াকে শারীরবৃত্তীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝবার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা থেকেই গড়ে ওঠে শর্তাধীন পরাবর্তভিত্তিক মনস্তত্ত্ব। পরে পাভলভ ল্যাবরেটরিতে প্রাণী এবং ক্লিনিকে মানুষদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মনোবিজ্ঞানের এক বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বকে পোক্ত করেন। পক্ষান্তরে যে তত্ত্ব দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে আরও প্রতিষ্ঠিত করে। এই ফাঁকে জেফরি এ গ্রে তাঁর 'পাভলভ' গ্রন্থে কী লিখছেন একটু জানাই— 'One of the greatest puzzles we face is how to understand the relations between behaviour, mind and the brain. No one has done more than Pavlov to bring this puzzle out of the realm of philosophy and into the laboratory. In doing so, he established a vital bridge between physiology and psychology, two subjects which were virtually isolated from each other when his career began, but are now almost at the point of fusion; and he converted the programmatic sketches of nineteenth-century philosophical materialism into an experimental science whose methods and results now deeply affect our lives. For these reasons, Pavlov is justly regarded as one of the founding fathers of modern experimental psychology; and his influence on contemporary views of Man and his place in the world has been correspondingly great.'। যা মোটামুটি বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'আমরা সবচেয়ে বড় যে ধাঁধার সম্মুখীন হই, তা হল আচরণ, মন ও মস্তিষ্কের সম্পর্কটা কী। এই ধাঁধাটাকে দর্শনের চৌহদ্দি থেকে গবেষণাগারে নিয়ে আসার কাজটি পাভলভের চেয়ে কেউই বেশি করেন নি। এটি করতে গিয়ে তিনি শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু রচনা করেছিলেন, তাঁর কাজ শুরুর আগে যা একে অপরের থেকে আলাদাই ছিল। আর সেটা বর্তমানে একসঙ্গে মিলে যাওয়ার মুখে। তিনি ঊনবিংশ শতকের দার্শনিক বস্তু বাদকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে বদলে দিয়েছিলেন। যার পদ্ধতি এবং ফল আমাদের জীবনকে এখন গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। এই কারণেই, পাভলভকে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম জনক বলে গণ্য করা হয়। এবং মানুষ ও বিশ্বে তার স্থান নিয়ে সমসাময়িক ভাবনাকে তিনি যেভাবে প্রভাবিত করেছেন, সেই নিরিখে তা অনবদ্য।' গ্রে সাহেব যাই বলুন, পাভলভের নিজের দেশের অনেক পণ্ডিতও প্রথম দিকে তাঁর গবেষণাকে আমল দিতে চান নি। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে তাঁকে দেশের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সভ্য করা হয়, খানিকটা দায়ে পড়েই। এরপরও শর্তাধীন পরাবর্ত নিয়ে শ্লেষোক্তি চলতে থাকে — 'ভারি তো! এ আবার বিজ্ঞান নাকি! সার্কাসে বাঘের খেলা দেখায় যারা, কুকুরকে ট্রেনিং দিচ্ছে যারা, বহুকাল আগে থেকেই 'কন্ডিশনড রিফ্লেক্স'-এর কেরামতি তাদের জানা' ইত্যাদি ইত্যাদি। কনফারেন্স ইত্যাদিতে তাঁরে গবেষণাপত্র পড়তেও বেগ পেতে হত। তবে এসব করেও তাঁর প্রতিভা ও আবিষ্কারকে শেষমেশ উপেক্ষা করা যায় নি। একে পাভলভ রাশিয়ান, তায় তাঁর তত্ত্বে বস্তুবাদের ম ম করা গন্ধ। স্বভাবতই ঠাণ্ডা লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ মার্কিনি পণ্ডিতেরা এসব তত্ত্বকে সেই সময় আমলই দিতে চান নি। আমাদের দেশ তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করত ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে। ফলে দীর্ঘদিন পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান আড়ালেই পড়ে থাকে। আমরাও জানতে পারতাম না, ধীরেন্দ্রনাথ ময়দানে না নামলে। সলতে পাকানো পর্ব আগেই শুরু হয়েছিল। ১৯৫১ সালে আত্মপ্রকাশ করল পাভলভ ইনস্টিটিউট। শুরু হল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ দেশে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান চর্চা।

যোগসূত্র —সেটা আশির দশকের গোড়া। 'উৎস মানুষ' পত্রিকার জয়রথ প্রবল বেগবান। বন্ধু মদন ওরফে অচিন্ত্য পাল ছিল পত্রিকার একনিষ্ঠ প্রচারক। একাই ৭০-৮০টা পত্রিকা বিক্রি করত। ওর সঙ্গেই প্রথম যাই কলেজ স্ট্রিটের বৈঠকখানা রোডে দপ্তরি নিবারণদার ঠেকে। অশোকদা, ভাস্করদা, পবনদাদের সঙ্গে আলাপ। উৎস মানুষের একজন হয়ে ওঠা। সেই মদন একদিন বলল, 'চল, ধীরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করি। উনি বিজ্ঞান আন্দোলনের সমর্থক, যুক্তিবাদী মানুষ।' ধীরেনবাবু মানে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। ওঁর বিখ্যাত 'পাভলভ পরিচিতি' ততদিনে পড়ে ফেলেছি। তখন সেটি চার খণ্ডে প্রকাশিত। যাতায়াতের পথে হাতিবাগানে ফড়িয়াপুকুরে জলযোগ-এর মিষ্টির দোকানের ওপর পাভলভ ইনস্টিটিউট ও মানবমন-এর সাইনবোর্ডও দেখেছি। মস্তবড় মনোরোগ চিকিৎসক। আমি তখন সদ্য বিএসসি। উনি আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের পাত্তা দেবেন কেন! মদনকে নিরস্ত করা গেল না। একদিন ধরে নিয়ে গেল। দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁদিকে ঘরটা ছিল রোগী ও তাঁর আত্মীয়দের প্রতীক্ষালয়, অন্যসময় বৈঠকখানা। মঙ্গলবার ধীরেনবাবু খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রোগী দেখতেন না। সেই বৈঠকখানায় বন্ধু, পরিজন, অনুগামী, সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের নিয়ে আড্ডা জমাতেন। নাটকের মহড়া দিতেন। আসত চা, উল্টোদিকের ফ্রেন্ডস কেবিন (ফড়িয়াপুকুরে ঢোকার মুখেই ছিল সেই দোকান, এখন নেই) থেকে চপ-কাটলেট। আমরা দুই স্যাঙাত সকুণ্ঠ গেলাম। পরিচয় দিলাম। উনি শুধু সহজভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন তাই নয়, আমাদের রীতিমতো গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করে দিলেন। বিজ্ঞান-আন্দোলন ইত্যাদি নানা বিষয়ে জানতে চাইলেন। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের জড়তা চলে গেল। মনেই হল না, উনি এক বিরাট মাপের মানুষ। সেই শুরু নিয়মিত যাতায়াত। মদন রুজির ধান্দায় বিজ্ঞান আন্দোলন থেকে সরে যায়। আমি হয়ে উঠি শুধু পাভলভ ইনস্টিটিউটই নয়, ওঁর পরিবারেরও অন্যতম সদস্য। ধীরেনবাবুর অনেক বিষয়ের অবলম্বন। ওঁর অবিন্যস্ত বইপত্র গুছিয়ে দেওয়া, কোথায় কী বই বেরোচ্ছে তার হদিশ দেওয়া বা কিনে দেওয়া, নাটকের দলে অভিনয়, মানবমন পত্রিকার জন্য প্রেসে দৌড়ঝাঁপ (ওঁর কাছেই প্রথম প্রুফ দেখা শেখা), আলোচনা সভার আয়োজন থেকে পিকনিক — জুড়ে যাই আমিও। আমি তখন আক্ষরিক অর্থেই বিবলিওম্যানিয়াক, মানে বইপাগল। আমেরিকার প্রমেথিউস বুকস 'ডিড জেসাস এগজিস্ট'-এর মতো অন্য ধরনের বই ছাপে। ওদের থেকে 'অবজেকশন্‌স টু অ্যাস্ট্রোলজি' আর জেমস র‍্যান্ডির 'ফিল্মফ্ল্যাম' আনিয়েছিলাম। এই জেমস র‍্যান্ডি এক মার্কিন জাদুকর এবং কুসংস্কারবিরোধী লড়াইয়ের সৈনিক। কেউ অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারলে উনি ১০ হাজার ডলার দেবেন, এমন চ্যালেঞ্জ ঠুকে রেখেছিলেন। কেউই সেটা নিতে পারেনি। এছাড়া হোমিওপ্যাথির ডাইলিউশন তত্ত্ব নিয়ে ফরাসি বিজ্ঞানী জাঁ বেনেভিস্তের আলোড়নকারী পরীক্ষা যে অসার, তা প্রমাণের জন্য নেচার পত্রিকার যে দল গিয়েছিল, উনি সেই দলেও ছিলেন। যাই হোক, দুটো বই-ই উনি মহা আগ্রহের সঙ্গে পড়লেন। প্রমেথিউস বুক্‌স নিয়মিত ক্যাটালগ পাঠাত। সেখান থেকে আধুনিক সাইকিয়াট্রির কয়েকটা বই আনিয়ে দিতে বললেন। দিয়েছিলাম। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল আত্মীয়তা। তখন ওঁকে রোগী দেখার সময় সাহায্য করতেন ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত। ইন্দ্রদা। পরে জেনেছি এই ইন্দ্রদা ও তাঁর স্ত্রী পৃথাদি অতিবাম দলের সমর্থক। আরেক ছাত্র ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় তখন বহরমপুর জেলের ডাক্তার। ডাক্তারবাবুর মুখে শুনতাম, সেও অতিবাম যোগের কারণে প্রশাসনের চক্ষুশূল। তাকে কীভাবে কলকাতায় বদলি করে আনা যায়, তা নিয়ে খুব ভাবতেন। এরকম বহু অতিবাম কর্মী-নেতার সঙ্গে ধীরেনবাবুর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুভাষ গাঙ্গুলির সঙ্গে আলাপ ওঁর এখানেই। সুভাষদার স্ত্রী ভারতীদি বেশ উঁচুতলার নকশালপন্থী নেত্রী ছিলেন। অডিট অফিসের উচ্চপদে কাজ করতেন। এইসব কারণে ধীরেনবাবুকে অনেকেই নকশালপন্থী-দরদী বলে দাগিয়ে দিত। (এখনকার সময় হলে হয় ডাঃ বিনায়ক সেন, ভারভারা রাওয়ের মতো 'নকশালপন্থী সিমপ্যাথাইজার' বলে জেলের ঘানি টানাত।) বিপরীতে হীরেন মুখোপাধ্যায়, ভূপেশ গুপ্ত, গোপাল হালদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে অনেক নকশালপন্থী মনে করতেন, উনি আদতে সিপিআইয়ের লোক। এ নিয়ে উনি মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতেন। আসলে ছিলেন স্বাধীনচেতা।

কোনো রাজনৈতিক দলের আনুগত্য ওঁর পোষাত না। খোলামনের মানুষ। সবার ছিল অবারিতদ্বার। বিভ্রম তাতেই। এ প্রসঙ্গ পরে।

বাণিজ্যে বসতি — আদিনিবাস খুলনায় হলেও ধীরেন্দ্রনাথের জন্ম উত্তর কলকাতায়, এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। ২৫ ডিসেম্বর ১৯১১। বাবা শৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মা তরুবালা দেবী। তবে ছোটবেলাটা কেটেছে খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে। ১৯২৫-এ সব বিষয়ে লেটার পেয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান, এখন বাংলাদেশ) থেকে। ভাল ছাত্র বলে বৃত্তি পেতেন। তারপর চলে আসেন কলকাতায়। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাস করেন বঙ্গবাসী কলেজ থেকে। ১৯৩৩-এ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করেন ডাক্তারি। ভালো ছাত্র হিসাবে ডাক্তারি পড়ার সময়ও বৃত্তি পেয়েছেন। সেই সময় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালি ছেলেদের ব্যবসা করার জন্য লাগাতার উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। তাতেই উৎসাহিত হয়ে ধীরেন্দ্রনাথ ঠিক করলেন ডাক্তারি নয়, ব্যবসা করবেন। আর সেটা গুঁড়ো দুধের। তখন এ দেশে গুঁড়োদুধের রমরমা নেই তো বটেই, চলই নেই। ফলে গুঁড়োদুধের ব্যবসা করব বললেই তো হল না! দেশে তো গুঁড়োদুধের ব্যবসা করার মতো উপায়-উপকরণ কিছুই নেই! হালছাড়ার পাত্র ছিলেন না। শুনেছিলেন, অস্ট্রেলিয়ায় এ নিয়ে পড়াশোনা করা যায়। ঠিক করলেন সে দেশেই যাবেন। সেইমতো উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দিলেন অস্ট্রেলিয়ায়, ১৯৩৭ সালে। ফিরে এসে শুরু করলেন গুঁড়োদুধের ব্যবসা। ১৯৩৯ সালে ভাইটামিনযুক্ত দুগ্ধজাতীয় খাবার তৈরির ক্ষেত্রে রাশিয়াতে সর্বপ্রথম কৃতিত্ব দেখানোর জন্য স্বীকৃতিও অর্জন করলেন। তবে এই ব্যবসায়িক উদ্যোগ খুব একটা সফল হল না। আর সেটা শাপে বরই হল। এ সবের মধ্যেই ১২ মে, ১৯৪৩ বিয়ে করেন অমিয়াকে। যদিও বিয়ে করার মতো আর্থিক পরিস্থিতি ছিল না। কিন্তু দুটি বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্যই তাঁকে বিয়ে করতে হয়। সেই সময় সংসারহীন লোকের বাড়ির মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিল না। কেন ব্যবসায় মার খেলেন, সে সম্পর্কে ধীরেন্দ্রনাথের সাফাই : 'গুঁড়োদুধের ফ্যাক্টরি করব বলে পি সি রায়ের চিঠি নিয়ে আমি অস্ট্রেলিয়া চলে গেলাম। চিঠিতে মিথ্যে কথা লেখা হল। বলা হল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমি। ওখানে গুঁড়োদুধের কারিগরি শিখতে চাই। অস্ট্রেলিয়া গিয়ে শিক্ষার্থী হয়ে গেলাম নেসলস কোম্পানির একটি কারখানায়। সেটা ১৯৩৬-৩৭ হবে। ফিরে এসে খোলা হল কারখানা। কোম্পানির নাম দেওয়া হল 'ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস লিমিটেড'। আমি ছিলাম টেকনিকাল ডিরেক্টর। সুভাষচন্দ্র বসু তখন কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন দ্বিতীয়বারের জন্য। তিনি আমাদের কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। শুধু ভারতে নয়, গোটা এশিয়াতে আমিই প্রথম গুঁড়োদুধ তৈরি করি। অনেকের ধারণা, আমূল একাজ প্রথম করেছে। কলকাতার দমদমে এবং বেনারসে আমাদের দুটো ফ্যাক্টরি ছিল। যুদ্ধের সময় আমরা দিনে ৮০-৯০ মণ গুঁড়োদুধ বিক্রি করেছি। আমাদের দুধের নাম ছিল 'ভিটামিল্ক'। তখন আমার বয়স ২৫-২৬ হবে।' ধীরেনবাবু আরও জানান, 'তাঁদের কারখানায় তৈরি হত তিন রকমের দুধ— ভিটামিল্ক গুঁড়োদুধ, ভিটামিল্ক বিস্কুট এবং চায়ের জন্য গুঁড়োদুধ। দুধ বিক্রি করা হত ভ্যাকুয়াম প্যাক্‌ড টিনের কৌটোয়। এক টিন দুধের দাম ছিল ১ টাকা ১২ আনা। তখন বাজারে বিদেশি দুধ আসত। কিন্তু তার দাম ছিল বেশি। গ্ল্যাক্সোর এক টিন দুধের দাম পড়ত ২ টাকা ৪ আনা। ফলে প্রথম কয়েক বছর বেশ ভালোই লাভ হত।' ওঁর এই উদ্যোগে শরিক ছিলেন ডাঃ নীহাররঞ্জন মুন্সি, ডাঃ সুনীল বসু প্রমুখ। পরে যুদ্ধের ডামাডোলে দেশের বাজারে গরুর দুধের দাম হঠাৎ ৬ টাকা থেকে লাফিয়ে হয়ে যায় ৪০-৪৫ টাকা মণ। সেই দুধ কিনে গুঁড়োদুধ তৈরি করে বিক্রি করা আর পড়তায় পোষাল না। তাতে এক কৌটো দুধের দাম অনেক পড়ে যেত। সেই তুলনায় বিদেশি দুধের দাম বাড়ল না। ফলে ব্যবসাটা তুলেই দিতে হল! বিশ্বাসীরা প্রায়শই বলে থাকেন — ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। ভগবান কার, কখন, কেন, কীভাবে, কতটা মঙ্গল বা অমঙ্গল করেন, তা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন। তাই তিনি করুন বা না করুন, এক্ষেত্রে দেশ ও দশের মঙ্গলই হল। ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেলে আমরা আর মনোবিদ তথা মনোরোগ চিকিৎসক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে পেতাম না। পরিচিত হতে পারতাম না পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের সঙ্গেও।

দুধ ছেড়ে মনে — ডাক্তারি পাস করলেও তাগিদ ছিল সমাজসেবার। তাই পাস করেই বিহারে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণের কাজে লেগে পড়েন। সেখান থেকে ফিরে শুরু ব্যবসা। আর সেই ব্যবসা যখন হলই না, তখন ধীরেন্দ্রনাথ আগ্রহী হয়ে পড়লেন ডাক্তারি করায়। তবে শরীর

নয়, বিষয় হিসাবে বেছে নিলেন মনোরোগকে। এ প্রসঙ্গে একথা বলা যেতেই পারে যে, ধীরেন্দ্রনাথের পাভলভ-প্রেমের পিছনেও ঘুরপথে হাত রয়েছে গুঁড়োদুধের। কারণ, গুঁড়োদুধ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করতে যাওয়ার দৌলতেই ওঁর সঙ্গে পাভলভের কাজকর্মের নিবিড় পরিচয়। উনি যখন সে দেশে ছিলেন তখন সেখানে এসেছিলেন ডাঃ নর্মান বেথুন। উনি পাভলভের মৃত্যুতে অস্ট্রেলিয়া হয়ে রাশিয়া যাচ্ছিলেন। এই নর্মান বেথুন ছিলেন কানাডার চিকিৎসক। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী। মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনে যখন বিপ্লব শুরু হয়, তিনি তাতে গিয়ে যোগ দেন চিকিৎসক হিসাবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের রক্ত দেওয়ার ভ্রাম্যমাণ পরিষেবা উদ্ভাবন করেছিলেন। জাপান চীন আক্রমণ করলে লালফৌজের সেনানীদের বাঁচাতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। শুধু অস্ত্রোপচার নয়, একঝাঁক চিকিৎসককে হাতে কলমে তৈরিও করেছেন। এক মিশনারি সন্ন্যাসিনীকে বুঝিয়ে বহু চিকিৎসার সরঞ্জাম ও ওষুধ আনানোর ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছাকাছি না গেলে বেশি সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানো যাবে না, এই ভাবনায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একেবারে রণাঙ্গনে গিয়ে চিকিৎসা করতেন। একবার লালফৌজের আহত এক সৈনিককে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে ফেলেন। তারপর খালি হাতে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে লালফৌজ সেনানীর ক্ষতের রক্তে বিষিয়ে যায় ওঁর রক্ত। নিজের পরিণতি বুঝতে পেরে সমস্ত কাজ গুছিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাও সে-তুং 'ইন মেমোরি অভ নর্মান বেথুন'-এ লিখছেন, 'What kind of spirit is this that makes a foreigner selflessly adopt the cause of the Chinese people's liberation as his own? It is the spirit of internationalism, the spirit of communism, from which every Chinese Communist must learn.' এর বাংলা করলে দাঁড়ায় — কী সেই উদ্দীপনা, যা একজন বিদেশিকে স্বার্থহীনভাবে চীনের মানুষের মুক্তির আন্দোলনকে নিজের আন্দোলন করে নিতে পারে? এটা হল আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্দীপনা, কমিউনিজমের উদ্দীপনা, যা থেকে প্রতিটি চীনা কমিউনিস্টের অবশ্যই শিক্ষা নেওয়া উচিত।'

লাভ পাভলভ — পাভলভ মারা যান ১৯৩৬ সালে। তাঁর এক স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পথে অস্ট্রেলিয়ায় কিছুদিন ছিলেন ডাঃ নর্মান বেথুন। ধীরেনবাবু অস্ট্রেলিয়ায় যেখানে পেইংগেস্ট হিসাবে থাকতেন, তার পাশের বাড়িতেই উনি উঠেছিলেন। গৃহকর্ত্রীর মুখে ধীরেনবাবু পাভলভ ও ডাক্তার বেথুন সম্পর্কে অনেক গল্প শোনেন। শুধু তাই নয়, বেথুন যাওয়ার সময় রাশিয়ান ভাষায় লেখা পাভলভ সংক্রান্ত কিছু বই ও কাগজপত্র তাঁর ঘরে ফেলে যান, সেটাও গৃহকর্ত্রীর দৌলতে ধীরেনবাবুর হস্তগত হয়। পাভলভের নাম তিনি আগেই শুনেছিলেন। ফলে এগুলো পেয়ে তাঁর আগ্রহ হয়। সেই শুরু হল তাঁর পাভলভ-সন্ধান। এ এক অভিনব তত্ত্ব, একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির। যার সঙ্গে প্রথাগত মনোবিজ্ঞানের একটুও মিল নেই। এক কথায় মজে গেলেন পাভলভীয় মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বে। কলকাতায় ফিরে রাশিয়ান দূতাবাসে খোঁজ করলেন কীভাবে পাভলভের বইপত্র পাওয়া যায়। তখন পাভলভের কাজকর্মের ইংরেজি অনুবাদ অমিল। ফলে রাশিয়ান সংস্করণে পাভলভের বইপত্র আনালেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেলেন রাশিয়ান ভাষা শিখতে। কাগজপত্রগুলোর পাঠোদ্ধার করে পাভলভ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেন। পরে ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ হীরেন মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন রাশিয়ান স্কুল অভ সাইকিয়াট্রিস্টস্-এর সঙ্গে। এখানেই ক্ষান্ত হওয়ার মানুষ ছিলেন না। তাই পাভলভ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ১৯৬১ এবং ১৯৭৭— দু-দুবার সোভিয়েত রাশিয়া গিয়েছিলেন। পারমাণবিক অস্ত্র ও তার মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য পেশ করতেও রাশিয়ায় যান '৬২ সালে, বিশ্ব শান্তি পরিষদে যোগদান করতে। চিকিৎসা শুরু করে নিজেকে নিছক প্রথাগত মনোরোগ চিকিৎসার মধ্যেই আটকে রাখলেন না। ঠিক করলেন, এ দেশের মানুষকে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে। কারণ ততদিনে, তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান। সেই লক্ষ্যেই ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন পাভলভ ইনস্টিটিউটের। তার দশ বছর পরে প্রকাশ করতে থাকেন ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মানবমন'।

(চলবে)

উমা

স্বচিকিৎসা — পর্ব ৭

তস্য পর্ব ঃ বার্ধক্য ২

গৌতম মিস্ত্রী

কিছু শারীরিক কষ্ট একটু অন্যরকমের — অন্যরকম তার কারণ আর তার সমাধান। চেনা রোগের চিকিৎসার জন্য হাজারো রকমের ট্যাবলেট, সিরাপ, ইনজেকশন, মলম, করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, স্টেন্ট ইত্যাদি আছে। সেই চিকিৎসায় রোগের উপশম, রোগমুক্তি ইত্যাদি মিললেও কিছু রোগের রোগলক্ষণ সর্বোত্তম চিকিৎসা সত্ত্বেও থেকে যায়। সেটা অবহেলার যোগ্য নয়। সেই রোগের নাম বার্ধক্য। যার সমাধানে এখনও কোনো ম্যাজিক ওষুধ আবিষ্কার করা যায়নি। সেই কষ্টের না-অসুখ বা বার্ধক্য মানব শরীরের এক প্রাকৃতিক অমোঘ অন্তিম অবতার। তার নিরাময়ে কোন ম্যাজিক ট্যাবলেট বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। বার্ধক্য তো আর কোনো রোগ নয়। বার্ধক্য হল অসুখের এক 'না-রোগ-অবতার' — যার ওষুধ নেই। কেমনে তার মোকাবিলা করা যায়? আসুন, তার আলোচনায় কিছুটা সময় ব্যয় করি।

সমস্যা - ১ — শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষমতা কমে যাওয়া: বয়স বাড়লে কালের অমোঘ নিয়মে সময় এগোয়, বয়স বাড়ে — বয়স মোটেই কমে না। আমরা ধরে নিচ্ছি যৌবনের নাচনকোঁদনের পালা সাঙ্গ হবার পরেও আমাদের হার্ট, ফুসফুস, হাত, পা ও হাঁটু ঘটনাচক্রে রোগমুক্ত। তবুও বয়স বাড়লে আমাদের অনেকের রেলওয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজে ওঠার পরে হাঁপাতে হয়। আগের মতো দশ কিলো সবজি বাজার করে হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারি না — রিক্সায় চড়তে হয়।

বিনা বিতর্কে বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, হাঁপ ধরারর অর্থ এই যে, যে পরিশ্রমে তেমনটা হচ্ছে, সেই পরিশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পরিশ্রমে অংশ গ্রহণ করা পেশিতে যথেষ্ট পরিমাণে পৌঁছাতে পারছে না। ফলে পেশিতে আংশিক অক্সিজেনের অভাবে পেশিতে 'অ্যানেরোবিক গ্লাইকোলিসিস (anerobic glyclysis)' প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ আধপোড়া হয়ে শক্তি জোগাচ্ছে। 'অ্যানেরোবিক গ্লাইকোলিসিস' প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের অভাবে শক্তি তৈরি করার প্রচেষ্টায় শক্তি তৈরির একটি কাঁচামাল গ্লুকোজ আধপোড়া হয়ে ঠেকা দেয় সাময়িকভাবে। সেভাবে শক্তি জোগাতে আমাদের শরীর বাধ্য হলে আমাদের হাঁপ ধরে — সেই পরিশ্রম আমরা বেশিক্ষণ চালিয়ে যেতে পারি না। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রপেশিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছতে পারলে সমস্যা হত না, কিন্তু সেটা না হতে পারলে অক্সিজেন বিনা শক্তি তৈরি করার জন্য যে বন্দোবস্ত আমাদের শরীরে আছে সেটা কোনোমতে কাজ চালিয়ে নেবার জন্যই। খুব একটা ভরসাযোগ্য উপায় নয় এই অক্সিজেন বিনা শক্তি উৎপাদনের 'অ্যানেরোবিক গ্লাইকোলিসিস' প্রক্রিয়া। আমাদের নশ্বর শরীরকে বাঁচিয়ে রাখাপ প্রক্রিয়া হিসাবে বেকায়দায় অপ্রস্তুত অবস্থায় অ্যানেরোবিক গ্লাইকোলিসিসের মাশুল বিশাল — আমাদের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়াম হল হৃদপিণ্ড আর ফুসফুসের কর্মক্ষমতার (যুগলবন্দীর) সর্বোত্তম কর্মদক্ষতা বজায় রাখার বিনে পয়সার একমাত্র উপায়। 'এ' থেকে 'জেড' অবধি ভিটামিনে ভরপুর ক্যাপসুল এটার ভগ্নাংশও দিতে পারে না। বিজ্ঞান এমন ভরসা দেয় না।

ফুসফুসে অক্সিজেন-পিয়াসী রক্ত ও ফুসফুসের এলভিওলাসে মিলনের অভিসারে অপেক্ষায় থাকা বাতাসের অক্সিজেনের সাথে রক্তের প্রেমে বিস্তর বাধা (Ventillation perfusion (VQ) Mismatch) --- 'ভেন্টিলেশন-পারফিউশন অসাম্য'।

একটু বিস্তারে বলা যাক। কায়িক পরিশ্রম করার ক্ষমতার একটা প্রাথমিক প্রয়োজন হল কর্মরত মাংসপেশিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছে যাওয়া। এখানে প্রথম সীমাবদ্ধতা আসে হৃদপিণ্ড আর ফুসফুসের সম্মিলিত কাজের দক্ষতায়। ফুসফুসের যে অংশে এই মহান কাজটি সংঘটিত হয় তার নাম 'এলভিওলাস'। ফুসফুসের এলভিওলাসেই বাতাসের অক্সিজেনের আমাদের রক্তে যাওয়া-আসার মহান ক্রিয়াটি সংগঠিত হয়। এখানেই, ফুসফুসের এলভিওলাসেই, মানব শরীর জীবনের একটি অপরিহার্য রসদ, 'অক্সিজেন' আত্মস্থ করতে পারে।

এলভিওলাস একটা ছোট বেলুনের মতো ফুসফুসের শাখা-প্রশাখার শেষ অংশ যেখানে আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস পৌঁছে যায় আমাদের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে। এলভিওলাস নামের বেলুনের গায়ে থাকে অক্সিজেন গ্রহণে অপেক্ষায় থাকা 'পালমোনারি ধমনির (Pulmonary artery)' রক্তজালিকার (capillary) অক্সিজেন নিষ্কাশিত রক্ত। কম অক্সিজেনওয়ালা পালমোনারি ধমনির রক্তজালিকা আর এলভিওলাসের অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাসের মধ্যে পাতলা একটা আবরণ থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে মিলনের আগ্রহী বাতাসের অক্সিজেন পালমোনারি ধমনির রক্তজালিকায় ঢুকে পড়ে অসমোসিস (osmosis) নামের এক ভৌত (physical) প্রক্রিয়ায়।

হৃদপিণ্ড আর ফুসফুসের কাজের যুগলবন্দীর কথাটার অন্তিম ব্যাখ্যা প্রয়োজন আমাদের নেচেকুঁদে বেঁচে থাকার আবশ্যিক শর্ত হিসাবে। ফুসফুসের এলভিওলাসে, যেখানে আমাদের পরিমণ্ডলের অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস পৌঁছে যাচ্ছে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে, তার দেওয়ালের পালমোনারি ধমনির রক্তজালিকায় রক্ত প্রবাহ বজায় রাখা প্রয়োজন। এটা হৃদপিণ্ডের ও হৃদপিণ্ড থেকে ফুসফুসে যোগাযোগ রাখা রক্তনালীর (পালমোনারি ধমনির) কাজ। এই সুমহান কাজের জন্য নিঃশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে টেনে নেওয়া অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে পালমোনারি ধমনি রক্তজালিকার অক্সিজেন নিষ্কাশিত রক্তের মিলিত হওয়ার উপযুক্ত উপায় দরকার। হয়ত ফুসফুসের কোনো এলভিওলাসের মধ্যে অপেক্ষায় থাকা অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস আছে, কিন্তু এলভিওলাসের গায়ে রক্তনালীর অক্ষমতায় বা রক্তনালীর রোগে সেখানে রক্ত পৌঁছাতে পারছে না তাহলে সেই এলভিওলাসের বাতাসের অক্সিজেন শরীরে ঢুকতে পারবে না।

আবার উল্টোটাও সত্যি। যেখানে অক্সিজেন গ্রহণকারী পালমোনারি ধমনি রক্তজালিকায় রক্ত প্রবাহ বজায় আছে সেখানে এলভিওলাসে বায়ুমণ্ডল থেকে শ্বাসের মাধ্যমে টেনে নেওয়া অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস পৌঁছানো জরুরি। কিছু এলভিওলাস চুপসে থাকে বা রোগাক্রান্ত থাকে — নিঃশ্বাসের হাওয়া সেখানে পৌঁছায় না, সেই এলভিওলাসের আবরণের বাতাসের অক্সিজেন অপিক্ষায় থাকা রক্তজালিকার রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ না করেই সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার জন্য রক্তের মূলস্রোতে ফিরে যায়। আবার এটাও সত্যি, বহু ক্ষেত্রে পাশাপাশি কয়েকটা এলভিওলাসের মধ্যেকার রক্তজালিকা সহ আবরণ ফেটে যায় ধূমপানজনিত ও অন্যান্য রোগের কারণে। অনেকগুলি অক্সিজেন সমৃদ্ধ এলভিওলাসের মধ্যেকার রক্তপিপাসু রক্তজালিকা সহ দেওয়াল তার অস্তিত্ব হারায়। তার ফলে অনেকগুলি এলভিওলাসের অক্সিজেন অসম্পৃক্ত রক্তের সাথে সম্পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না। ফলে যেটা হয়, সেটাকে একটা বিয়োগান্ত নাটকের এক রূঢ়, অপ্রিয় বাস্তব ঘটনার ফলাফলের সাথেই তুলনা করা যায়। অক্সিজেনের সাথে মিলনের অপেক্ষায় থাকা ফুসফুসের এলভিওলাসের দেওয়ালের রক্তজালিকার অক্সিজেন অসমৃদ্ধ রক্ত আর ফুসফুসের এলভিওলাসের মধ্যেকার অক্সিজেন সমৃদ্ধ হাওয়ার মিলন সর্বাত্মক হয় না দুইয়ের কর্মদক্ষতার চূড়ান্ত যুগলবন্দী না হওয়ার শারীরিক অসুস্থতার কারণে। অনেক সময়েই শরীরচর্চা না করা আপাত সুস্থ মানুষের এই যুগলবন্দী সর্বাত্মক হয় না।

আমাদের হৃদপিণ্ড আর ফুসফুসের কাজের যুগলবন্দী না হলে আমাদের হৃদপিণ্ড আর ফুসফুস সুস্থ সবল হলেও বয়স বাড়লে আমাদের রক্তের অক্সিজেনের খিদে মেটে না। আমাদের পরিশ্রম করলে হাঁপ ধরে। নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়াম হল হৃদপিণ্ড আর ফুসফুসের কর্মক্ষমতার (যুগলবন্দীর) সর্বোত্তম কর্মদক্ষতা বজায় রাখার বিনে পয়সার একমাত্র উপায়। 'এ' থেকে 'জেড' অবধি ভিটামিনে ভরপুর ক্যাপসুল এটার ভগ্নাংশও দিতে পারে না। বিজ্ঞান এমন ভরসা দেয় না।

বুড়ো হবার সাথে সাথে বার্ধক্যের অমোঘ নিয়মে ফুসফুসে রক্তজালিকার রক্তের সাথে ফুসফুসে টেনে নেওয়া বাতাসের অক্সিজেনের মিলনের এই ক্রম ক্ষয়িষ্ণু অমিলনাত্মক পরিণতির ব্যক্তিগত সাক্ষের তথ্যগত সমর্থনের অভাব নেই। কুড়ি বৎসর বয়সের এক যুবকের চেয়ে রোগাক্রান্ত নয় এমন সত্তর বৎসর বয়সী মানুষের ফুসফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা ৪৬ শতাংশ কম বলে জানা যাচ্ছে এক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে। এটাও জানা যাচ্ছে, এর ফলস্বরূপ রোগবিহীন যৌবন অতিক্রান্ত মানুষের রক্তের অক্সিজেন সম্পৃক্তের মাত্রা স্বাভাবিকের (১০০%) চেয়ে ৬ শতাংশ কম হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুস ক্রমাগত অনমনীয় হতে থাকে। বৃদ্ধ মানুষের প্রতিটি শ্বসন প্রক্রিয়ায় যৌবনের চেয়ে কম পরিমাণের অক্সিজেন রক্তে মেশে। ফুসফুসের অনমনীয়তার সঙ্গে 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে'র

মতো ফুসফুসের হাপরের কাজ ক্রমশ কমতে থাকে। ফুসফুসের কর্মক্ষমতা, অর্থাৎ বুকের খাঁচার আয়তনের বাড়া-কমার যান্ত্রিক ক্ষমতাও কমতে থাকে (https://pubmed.ncbi.nim.nih.gov/9279253/)

শারীরিক কুশলতার (physical conditioning) অভাবের জন্য কেবল আমাদের নীরোগ শরীর থাকলেই আমরা স্বচ্ছন্দে দৌড়তে পারি না। দৌড়নোর জন্য প্রয়োজন সুস্থ ও শরীরচর্চার দ্বারা টিউনিং করা হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, রক্তনালী, কর্মরত পেশির রক্ত থেকে অক্সিজেন নিষ্কাশন করার সক্ষমতা। একজন নীরোগ মানুষকে সাত দিন বিছানায় শুইয়ে রাখলে সাত দিন পরে তার হেঁটে চলে বেড়ানোও দায় হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ থেকে ১৭ ঘণ্টা বা তার বেশি সময়ের (উড়ানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী) লম্বা বিমান সফর শেষে আমেরিকায় পৌঁছলে যাত্রীদের প্রথম কয়েক কদম হাঁটতে কষ্ট হয়। শরীর চর্চার ফলে হার্ট, ফুসফুস ইত্যাদি অঙ্গের একটা ধনাত্মক পরিবর্তন ঘটে। জীবনের সায়াহ্নে হেঁটে চলে বেড়ানোর ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য কৈশোর থেকে আমাদের শরীর চর্চা করে যাওয়া দরকার।

এটা বলাই বাহুল্য, তবুও বলা দরকার, কোনো কিশোর-কিশোরী পাঠক এই রচনা পড়লে ও এতে আস্থা থাকলে, আর সেটা প্রয়োগ করার প্রেরণা থাকলেই হবে না। তাঁরও আজীবন শরীর চর্চা চালিয়ে যাওয়া দরকার। শুধু এই জ্ঞানই যথেষ্ট নয় — এই চর্চায় প্রীতিও থাকা দরকার। জানা ও বিশ্বাস করা স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী নিজ নিজ জীবনে প্রয়োগ করতে না পারলে নিয়মানুগ শাস্তি আমাদের অভ্যাস বদলে সাহায্য করে না। দুঃখজনকভাবে আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরের প্রজন্মকেও সুস্থ থাকার এই অভিজ্ঞানে বিশ্বাস ও সুখকর অভ্যাসে রপ্ত করে দিয়ে যেতে পারে না। ধূমপানে আসক্ত মানুষকে বকাঝকা করলে সেই অভাগা মানুষটির কোনো উপকার হয় না। কেবল জ্ঞান থাকলেই হবে না, সেই অভিজ্ঞান প্রয়োগে আনন্দও দরকার। নইলে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' এই সতর্কবাণী উপেক্ষা না করে জ্ঞানীগুণী মানুষ ধূমপান বন্ধ করতেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমনটা নয়। অর্থাৎ সুস্থ থাকার অভিজ্ঞান জানার পরে, সেটাকে যাচাই করে তার সত্যতা জানার পরে সেটায় বিশ্বাসের একটা স্তর আছে, তারপরে সেটা প্রয়োগেরও একটা পর্যায় আছে। অন্তিমে আছে সেই পরিবর্তিত অভিজ্ঞান প্রয়োগের কর্মকাণ্ড আনন্দের সাথে চালিয়ে যাওয়া। এই শেষের স্তরটায় আটকে গিয়ে অধিকাংশ হতভাগ্য জ্ঞানীগুণী মানুষ জ্ঞানপাপী হয়ে যান।

নিয়মিত অ্যারোবিক শরীর চর্চা করলে আমাদের নীরোগ হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজে একটা যুগলবন্দী হয়, ফুসফুসে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বর্জন প্রক্রিয়ার দক্ষতা সর্বোত্তম হয়। শররীচর্চার এই অবতার 'অ্যারোবিক' শব্দটা লক্ষণীয়। একনাগাড়ে ৩০-৬০ মিনিট ধরে মাঝারি তীব্রতায় অ্যারোবিক ব্যায়ামে (পার্কে বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে গল্পগাছা করতে করতে নয়) দৌড়ঝাঁপের বা জোর কদমে হাঁটার ব্যায়াম করতে হয়। দৈনিক ৬০ মিনিট ধরে করলে সর্বোত্তম সুফল পাওয়া যাবে। যোগব্যায়াম বা হাল্কা ভারোত্তলনের ব্যায়ামের সুফল আলাদা। সময় ও প্রেরণার অভাব না হলে এই দ্বিতীয় ধরনের ব্যায়াম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থানে আসবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একজন নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়াম করা মানুষের বিশ্রামরত অবস্থায় নাড়ির গতি (pulse rate) কম থাকে, যেমনটা একজন অ্যাথলেটের থাকে। নাড়ির গতি (pulse rate) কম রেখে একই পরিশ্রম করার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা মানুষের হৃদপিণ্ড মিনিটে কমবার পাম্প করেই শরীরের সমস্ত অঙ্গে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ করতে পারে। একজন সাধারণ মানুষের হার্ট একবার পাম্প করলে যতটা রক্ত প্রবাহিত হয়, একজন অ্যাথলেটের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণটা বেশি। তাই তাঁদের হার্ট বিশ্রাম পায়। তাঁদের একক সময়ে হৃদস্পন্দনের হার অ্যারোবিক শরীরচর্চা না করা মানুষের চেয়ে কম। আর যেটা হাতে গরম যে সুবিধা তাঁরা উপভোগ করেন, সেটা হল বেশি 'দম' বা হাঁপিয়ে না গিয়ে বেশি পরিশ্রম করার ক্ষমতা। বিশ্রামরত অবস্থায় অথবা অফিস-কাছারিতে কায়িক পরিশ্রম না করা অবস্থায় ফুসফুসের সব এলভিওলাসে বাতাস পৌঁছায় না। বেশ কিছু এলভিওলাস চুপসে থাকে। অ্যারোবিক ব্যায়ামের দ্বারা এই চুপসে যাওয়া এলভিওলাসগুলিকে ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা যায়। অর্থাৎ নিয়মিত অ্যারোবিক শরীরচর্চার দ্বারা হৃদপিণ্ড আর ফুসফুস অনেক বেশি পরিশ্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকে। বৃদ্ধ বয়সে চলে ফিরে বেড়ানোর ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য, হে পাঠক আপনার বয়স যাই-ই হোক না কেন, নিয়মিত অ্যারোবিক শরীরচর্চা করুন।

উ মা

সুপ্রিম কোর্টের রায় ও যৌনকর্মীদের মর্যাদা

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

গত ১৯মে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নাগেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে বি আর ঘাভাই এবং এ এস বোপান্না, এই তিন সদস্যের এক বেঞ্চ যৌনকর্মীদের কাজকে 'পেশা'-র স্বীকৃতি দেন।

এই রায়ের ফলে আশা করা যায়, যৌনকর্মীদের দৈনন্দিন জীবনে অযথা পুলিশি উৎপীড়ন একটু হলেও, কমবে। যৌনকর্মীদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা জানেন দালাল, পুলিশ এবং একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর চক্কর কীভাবে এই মেয়েদের রোজগারের ভাগ পেতে উৎপীড়ন করে থাকে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে দেখেছি যে পুলিশের নানাভাবে হেনস্থা করার অভিযোগ সবচেয়ে বেশি আর তারপরেই বাড়িওয়ালি মাসিদের উৎপীড়নের অভিযোগ এই মেয়েদের কাছে শোনা যায়। একসময়ে এই কাজের সঙ্গে জড়িত কিন্তু বয়সের কারণে অক্ষম বয়স্কারাই সাধারণত বাড়িওয়ালি। তাদের অভিভাবকত্বে মেয়েদের কাজ করার কথা। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে আঁতাতের কারণে রক্ষকই হয়ে উঠেছে ভক্ষক। বস্তুত তারাও পুলিশের হাতের পুতুল হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। পুরোটাই একটা চক্রব্যূহ। আলাদা করে কারো দিকে আঙুল তোলা যায় না। একটা সমাজ বহির্ভূত অন্ধকার ব্যবস্থা। সেখানে সামাজিক ন্যায়বোধের নজরদারি নেই। আর প্রশাসনের একমাত্র মুখ স্থানীয় থানা। তারা যা বলবে সেটাই আইন। এইরকম একটা অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে তাঁদের অস্তিত্বটুকুকে অন্তত স্বীকার করে নেওয়া হল। তাঁরা যে এই দেশেরই মানুষ; সংবিধান, প্রশাসন, আইনি রক্ষাকবচ যে তাঁদেরও প্রাপ্য, এইটুকু সুপ্রিম কোর্টের ঘোষণায় প্রমাণ হল।

এই রায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, পতিতালয়গুলিতে রেইড করার সময় পুলিশ কোনওভাবেই এই মেয়েদের (যাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্বেচ্ছায় এই পেশায় যুক্ত) কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এবং ক্রিমিনাল আইনের ধারায় কেস দিতে পারবে না। ক্রিমিনাল কেসের ভয় দেখিয়েই এবং অপপ্রয়োগ করেই মূলত পুলিশি উৎপীড়ন চলে। এই রায়ে যৌনকর্মীর ব্যক্তিগত সুরক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে যৌনকর্মীদের কাজকে পেশার আইনি স্বীকৃতি দিলেও, আইনগতভাবে পতিতালয় চালানো এখনও নিষিদ্ধ এবং এই যৌন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আরও কিছু কিছু কাজও বেআইনি। যেমন দালালি, অর্থাৎ যৌনকর্মীর হয়ে উমেদারি করা, বা কাউকে এই পেশায় যুক্ত হতে প্রভাবিত করা।

রায়ে যা যা বলা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য — যৌনকর্মীরা আইনের সবরকম সুরক্ষার আওতায় আসবেন। কিন্তু অবশ্যই স্বেচ্ছায় এই পেশাকে বেছে নিতে হবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। দ্বিতীয়ত, যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত কোনও বিষয়কে অপরাধ করার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। যেমন কন্ডোম ব্যবহার করার বিষয়টি। এখানে বলে রাখা যায়, বহু ক্ষেত্রে যৌনকর্মীদের বাধ্য করা হয় কন্ডোম ব্যবহার না করতে, তার ফলে এইচ আই ভি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, যখনই কোনও যৌনকর্মী পুলিশের কাছে যৌন নির্যাতন বা অন্য কোনোরকম অপরাধের অভিযোগ জানাবে, যথাযোগ্য মর্যাদায় সেই অভিযোগ বিষয়ে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থত, মা যৌন ব্যবসায় আছেন বলে, কোনও সন্তানকে মায়ের কাছ থেকে আলাদা করা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা একেবারে অন্য কথা বলে। ছেলে-মেয়ে একটু বড় হলেই, মা হিসেবে তাঁরা চান, পতিতালয়ের পরিবেশ থেকে বের করে দিতে। কোথাও হস্টেলে রেখে, লেখাপড়া শেখাতে। এমনিতে, এখনও পতিতাপল্লীর ছেলে-মেয়েদের আর পাঁচটা সাধারণ বাড়ির ছেলেমেয়েদের স্কুলে নেওয়া হয় না। এমন একাধিক ঘটনা জানি, কর্তৃপক্ষকে নিতে বাধ্য করা হলেও, একটা না একটা ছুতোয় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মায়ের পক্ষে ছেলেমেয়েদের কীভাবে লেখাপড়া শেখানো সম্ভব, সে-বিষয়ে কোর্ট কোনও দিশা দেখাতে পারলে, বেশি প্রয়োজনীয় হত বলে মনে হয়।

সেই সঙ্গে গণমাধ্যমকেও কোর্ট সতর্ক করে দিয়েছে, যেন কোনোভাবেই যৌনকর্মীদের পরিচিতি প্রকাশ না পায়।

স্বেচ্ছায় এই পেশা বেছে নেওয়ার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে। কিন্তু এই প্রশ্ন থেকেই

যায় যে এই 'স্বেচ্ছা নির্বাচন' কতটা বাস্তবসম্মত? অধিকাংশ যৌনকর্মীর এই পেশায় আসার কাহিনী একটা অন্য বাস্তব পরিস্থিতির কথা বলে। প্রবঞ্চনা, দারিদ্র্য আর অসহায়তার বাস্তব। সামাজিক অসম্মানের বাস্তবতা। দুনিয়ার কোথাও একজন যৌনকর্মীও চান না তাঁর সন্তান এই পেশায় আসুক। কেন চান না? এই সঙ্গত প্রশ্নটি যদি আদালতের চিন্তার পরিধিতে স্থান পেত, তাহলে এই স্বেচ্ছা নির্বাচনের বিষয়টি হয়ত অন্যভাবে দেখা যেতে পারত। সমাজে যদি যথার্থ পুনর্বাসনের বিকল্প ব্যবস্থা করা যেত, একমাত্র তখনই স্বেচ্ছা নির্বাচনের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হতে পারে। নইলে বিকল্পহীন অবস্থায় নির্বাচনের প্রসঙ্গ আসা সম্ভব না।

পৃথিবীর নানা দেশে এই পেশাকে আইনি শিলমোহর দেওয়া হয়েছে অনেক আগেই। এবং তাঁদের দেশের নাগরিক হিসেবেই দেখে রাষ্ট্র।

বিভিন্ন দেশে, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, গ্রিস, সুইজারল্যান্ড, ইকুয়েডর, ব্রাজিল, নিউজিল্যান্ড এই দেশগুলির অন্যতম। এর মধ্যে জার্মানিতে এই পেশা ১৯২৭ সাল থেকে বৈধ। সেখানে সরকার পতিতালয় পরিচালনা করে। এই মেয়েরা ট্যাক্স দেন এবং আইনি ও রাষ্ট্রীয় সবরকম সুবিধা ও সহযোগিতা ভোগ করেন। দেশের অন্যান্য করদাতাদের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত যে যে ব্যবস্থা আছে, সবই এংদের জন্যও বরাদ্দ। স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পেনশন সবই পান।

আমাদের দেশের সবচেয়ে পুরনো এই পেশার সামাজিক স্বীকৃতি নেই বলেই বোধহয় দিন বদলের কোনও খবরই এখানে পৌঁছয় নি। শ্রম আইন লাগু তো বহুদূর। নাগরিকত্বের যথার্থ স্বীকৃতিও নেই। কিন্তু খুবই আশ্চর্যজনক যে ভোটাধিকার আছে।

সুপ্রিম কোর্ট যে রায়ই দিক না কেন, শেষপর্যন্ত সামাজিকভাবে সেই রায় গ্রাহ্য না হলে, তা খাতায় কলমে বন্দি হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হওয়ার কথা না।

হীন স্বাস্থ্য, যাবতীয় সাধারণ সুযোগ বঞ্চিত এবং মূলত দরিদ্র এই মেয়েদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন তখনই অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্তি পাবে, যখন সামাজিকভাবে আমরা (সবরকম সামাজিক সুবিধাভোগী শ্রেণির মানুষ) তাদের নিজেদের দেশবাসী হিসেবে মর্যাদা দেব। যদি দিই, তাহলে উচ্চ আদালতের এই পর্যবেক্ষণ মান্যতা পাবে। তার আগে পর্যন্ত কিছুই বদলাবে না।

উমা

একটি ব্যতিক্রমী বিবাহ পদ্ধতি

অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূল সমিতি সত্যশোধক বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য সহায়তা ও প্রচার করে থাকে। প্রচলিত বিবাহে যে জাঁকজমক ও অর্থের অযৌক্তিক প্রদর্শন হয়ে থাকে তা বন্ধ করাই এর উদ্দেশ্য। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এটা করতে গিয়ে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে যা তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার দিকে ঠেলে দেয়। মহারাষ্ট্রের মহান সমাজ সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এক বিবাহ পদ্ধতির প্রচার করেছিলেন যা ছিল সহজ ও সস্তা। এই পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ভূমিকা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে। মহাত্মা ফুলে সত্যশোধক সমাজের সূচনা করেছিলেন। তাই এই সমাজ যে বিবাহ অনুষ্ঠানকে মান্যতা দিয়েছে তাকে সত্যশোধক বিবাহ বলে অভিহিত করা হয়।

মহাত্মা ফুলে ছিলেন একজন মহান ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ও সমাজ সংস্কারক। আধুনিক ভারতে তার কর্মকাণ্ডের তুলনা মেলা ভার। ১৮৫০ দশকে তিনি শুরু করেন শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিপ্লব। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য ভারতে তিনিই প্রথম বিদ্যালয় শিক্ষার সূচনা করেন। হাজার হাজার বছর ধরে এইসব মানুষেরা শিক্ষার বুনিয়াদি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। অবমাননাকর ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথা ছিল এর মূল কারণ। এখনো হিন্দু ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে এই জাতিভেদ প্রথা। মহাত্মা ফুলের সবথেকে বড় দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য ছিল তার স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলেকে লিখতে ও পড়তে শেখানো। এরপর তিনি মেয়েদের জন্য পুনেতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেখানে সাবিত্রীবাই অন্যান্য মেয়ে ও মহিলাদের শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হন।

তার জীবদ্দশায় মহাত্মা ফুলে আরেকটি চমৎকার কাজ হাতে নিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষদের জন্য তিনি স্থানীয় উৎসবগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সহজ মারাঠি ভাষায় তিনি একটি বই লিখেছিলেন যার নাম 'সার্বজনিক সত্য ধর্ম'। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিভাবে এইসব উৎসব সাধারণ মানুষেরা পালন করবেন এই বইয়ে তিনি তারই বর্ণনা করেছিলেন। এই কাজ করার সময় প্রতিটি ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা এবং অনুষ্ঠানগুলির পবিত্রতা ও উৎকর্ষতার বিষয়ই ছিল তার প্রথম বিবেচ্য বিষয়। যারা ধর্মকে বৈষম্য ও কুসংস্কার প্রচারের কাজে লাগায় এবং যারা ঈশ্বরকে নিজেদের জীবনযাপনের জন্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে মহাত্মা ফুলে সেই সব মানুষদের বিরোধী ছিলেন। বৈদিক বিবাহ উৎসবে পুরোহিত, বর ও কনে এক বিজাতীয় ভাষায় কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে। মহাত্মা ফুলে এর

বদলে একটি সহজ বিবাহ উৎসবের প্রবর্তন করেন যেখানে বিবাহে উপস্থিত সবাইকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় এবং কোনো দুর্বোধ্যতা ছাড়াই বিবাহ অনুষ্ঠান সকলের কাছে বোধগম্য হয়।

কীভাবে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় — সত্যশোধক বিবাহ অনুষ্ঠান মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের বিবাহ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত। নিচে আমরা ধাপে ধাপে এর বর্ণনা করছি।

স্বাগত : পাত্র ও পাত্রীপক্ষের পাঁচ জন বিশিষ্ট বয়স্ক প্রতিনিধিকে বিবাহ মঞ্চে ডাকা হয়। সমবেত সুধীজনের সাথে তাদের পরিচয় দেওয়া হয় এবং তারা সম্বর্ধিত হন। এরা সাধারণত হন পাত্রপাত্রীর বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা বা কাকা-কাকিমার মতো গুরুজনেরা। মঞ্চে ডেকে নেওয়ার পরে এদেরকে মাল্যদান করা হয় এবং এরা একে অন্যকে মালা বা শাল উপহার হিসেবে প্রদান করেন। যিনি এই বিবাহ অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও প্রধান হিসেবে মনোনীত হন তাকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং উপস্থিত মানুষদের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটানো হয়।

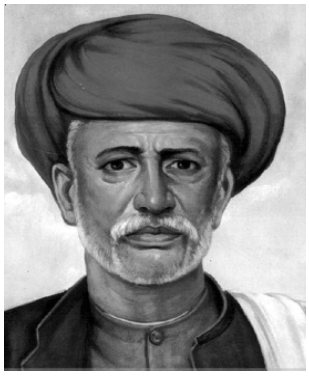

অগ্নি প্রজ্জ্বলন : বিবাহ অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এরপর মঞ্চে পাত্র ও পাত্রীকে নিয়ে আসার জন্য উভয়পক্ষকে অনুরোধ জানান। পাত্রপাত্রীর হাতে চন্দন কাঠের ছোট টুকরো দেওয়া হয়। এরপর তাদের নিম্নোক্ত কথাগুলি বলতে বলা হয়: ক) এই বিবাহ অনুষ্ঠান পবিত্র ও পরিষ্কার মনে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে এখন আমরা আমাদের মন থেকে সমস্ত নেতিবাচক ও ক্ষতিকারী চিন্তাকে নির্বাসিত করছি। প্রতীকী নিদর্শন হিসেবে আমরা এই চন্দন কাঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করছি। আমাদের সকল কু-অভিসন্ধি এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাক। জ্বলন্ত চন্দনকাঠের সুগন্ধ যেভাবে এই বাতাসকে সুগন্ধিত করে তুলছে আমাদের মনও সেইভাবেই পবিত্র হয়ে উঠুক। খ) পাত্র ও পাত্রী অগ্নিকুণ্ডের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াবে এবং মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে উপস্থিত সকলের শুভেচ্ছা তথা অগ্নি, বরুণ, পৃথ্বী, বায়ু, আকাশ ও জলের মতো প্রাকৃতিক শক্তির কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে। তারা পূর্বপুরুষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও মন্ত্র পাঠ করবে।

সপ্তপদী: এরপর অনুষ্ঠানের সঞ্চালক পাত্র-পাত্রীকে অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে বলবেন। তিনি তাদের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে বলবেন যা কিনা ভবিষ্যতে এক সুখী, ফলপ্রসূ, সফল, সমৃদ্ধ এবং উপযোগী বিবাহিত জীবনের সূচক হিসেবে পরিগণিত হবে। অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করার সময় পাত্র ও পাত্রী একে অপরের হাত ধরবে এবং প্রতিবার বৃত্ত সম্পূর্ণ করার সময় এই কথাগুলি উচ্চারণ করবে **:**

◆ আমাদের জীবন প্রেমময় হয়ে উঠুক, আমরা যেন একে অপরের প্রতি নিবেদিত থাকি। ◆সৃষ্টিকর্তার সকল সৃষ্টিকে আমরা যেন সম্মান ও যত্ন করতে পারি। ◆আমরা যেন একে অপরের মর্যাদা সর্বদা রক্ষা করতে পারি। অন্যদের কাছ থেকে যেমন আমরা সম্মান আশা করব তেমনি অন্যদের প্রতিও আমরা যেন সম্মান প্রদর্শন করতে পারি। ◆জাত, ধর্ম, বর্ণ অথবা লিঙ্গের ভিত্তিতে আমরা যেন কোনোরকম বৈষম্য না করি। ◆আমরা যেন শ্রমের মর্যাদা দিতে পারি। আমাদের জীবন ও স্বপ্ন পূর্ণ করার লক্ষ্যে আমরা যেন কঠোর পরিশ্রম করতে পারি যা কিনা আমাদের উপযোগী ও সহায়ক করে তুলতে পারে। ◆আমরা যেন যুক্তিপূর্ণ চিন্তার অধিকারী হই। দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য আমরা যেন শরীরের প্রতি যত্নবান হই। ◆আমরা যেন স্বাস্থ্য, সম্পদ ও জ্ঞানের অধিকারী হই। আমরা যেন আমাদের সন্তান সন্ততিদের ঠিকভাবে লালন-পালন করার ক্ষেত্রে সমর্থ ও যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

মঙ্গলগীত: এরপর অনুষ্ঠানে সঞ্চালক পাত্র ও পাত্রীকে মঞ্চের ওপর আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাবেন এবং তাদের হাতে ফুলের মালা ও পুষ্পস্তবক প্রদান করবেন।

পাত্রী বলবেন — ◆হে প্রিয়, আমি তোমার ভালোবাসার প্রার্থী, আমাকে তোমার সহযোগী রূপে গণ্য কোরো। ◆পারস্পরিক উন্নতির জন্য আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকব। ◆কোনো মহিলার কখনো সম্মানহানি কোরো না। ◆স্ত্রী হল প্রত্যেক স্বামীর চালিকাশক্তি — এ কথা সর্বদা মনে রেখো।

পাত্র বলবেন — ◆অন্য সকল মহিলা আমার ভগিনীতুল্য, একমাত্র তুমিই আমার প্রিয়া। ◆আজ এই সমবেত সুধীজনের উপস্থিতিতে আমি তোমাকে আমার বলে গ্রহণ করেছি। ◆আমরা আমাদের সংসার শকটের দুটি চক্রের মতো। আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এস আমরা এই দুটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

পাত্র ও পাত্রী একসঙ্গে বলবেন — • কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে রেখে আমরা সত্যের পথে চলব। • আমাদের পরিবার, সমাজ ও দেশের সম্মান রক্ষার কথা সর্বদা মনে রাখব। • আমাদের যদি

কোনো ত্রুটি হয় তা আমরা অতি সত্বর সংশোধন করব।

সমবেত মানুষেরা নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলবেন— • আজ তোমাদের বিবাহিত জীবনের সূচনা হল; তোমরা সুখী হও। • জীবনে চলার পথে তোমাদের উন্নতি কামনা করছি। • তোমরা মধুরভাষী ও উত্তম কর্মোদ্যোগী হও। তোমাদের পিতা-মাতা ও সমাজের প্রতি তোমাদের সম্মান ও কর্মোদ্যোগ যেন সর্বদা বজায় থাকে। • তোমাদের সুখী ও সফল ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। • সর্বদা সৎকার্য পালনের বিষয়ে তোমরা যেন সজাগ থাক। • এই আনন্দমুখর উৎসবে তোমাদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা। • সারা জীবনব্যাপী তোমাদের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির যেন অভাব না ঘটে। • তোমাদের সুখী ও সমৃদ্ধ বিবাহিত জীবনের জন্য শুভেচ্ছা রইল।

শপথ: পাত্র বলবে — আজ থেকে আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করছি। আমি তোমার প্রতি যত্নবান হওয়ার শপথ নিচ্ছি। আমি কখনোই তোমাকে সন্দেহ করব না, কোনোভাবেই তোমাকে কষ্ট দেব না অথবা তোমার ক্ষতি করব না। আমি তোমাকে সর্বদাই তোমাকে সম্মান করব এবং সুখী রাখব।

পাত্রী বলবে — আজ থেকে আমি তোমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করছি। আমি শপথ গ্রহণ করছি যে আমার মনে আমি কোনোরূপ সন্দেহ রাখব না। সুখে-দুঃখে আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে থাকব। আমি তোমাকে কখনোই কষ্ট দেব না বা তোমার ক্ষতি করব না। আমি সর্বদাই তোমাকে সম্মান করব এবং সুখী রাখব।

এরপর পাত্রপাত্রী উভয়ে মালাবদল করবে এবং একে অপরকে পুষ্পস্তবক প্রদান করবে। পাত্র পাত্রীর গলায় মঙ্গলসূত্র পরিয়ে দেবে। পাত্রী একটি হার পাত্রের হাতে দিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিতে বলবে। অবশেষে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এই ঘোষণা করবেন যে পাত্র ও পাত্রীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। সঞ্চালক পাত্র ও পাত্রীকে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর অনুরোধ জানাবেন। পাত্র-পাত্রী করজোড়ে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাবে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি আধঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন হবে।

ভাষান্তর — পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

উ মা

শ্রীলঙ্কা জৈব কৃষি পদ্ধতি ও পরিবেশবাদী অতিসক্রিয়তা

সুশান্ত মজুমদার

সময়টা ১৯৬৫-৬৬ সাল। রবিবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়া একটা ছেলে যাদবপুর বাজারের কাছে পান্নাবাবুর রেশনের দোকানে গিয়ে তারের জালের ফাঁক দিয়ে তিনটে কার্ড জমা দিয়ে লাইনে দাঁড়ায়। বিরাট লাইন। রেশন পেতে ঘণ্টা দুই-আড়াই লেগে যায়। দুজন পুরুষ, একজন মহিলা এইভাবে লাইন এগোয়। লাইনে ঝগড়া-ঝাঁটি, খদ্দেরদের যা কিছু অভিযোগ, তা পোকাধরা চাল, সাদা আমেরিকান গম বা এই সপ্তাহে চিনি সাপ্লাই নেই কেন, সবই পান্নাবাবুর স্ত্রী তার দাপুটে মেজাজে সামলে নেন। লাইন এগোতে এগোতে কাউন্টারের প্রায় সামনে এসে পড়লে ছেলেটা সতর্ক হয়ে ওঠে। ফাইন রাইসের কোয়ালিটি বুঝতে হবে, কারণ নামে ফাইন হলে কি হবে অনেক সময়েই রেশনের চাল এত পুরনো আর গুটলি পাকানো থাকে যে তা কারোর মুখে ওঠে না। অগত্যা বাড়ির কাজের লোককে দিয়ে দিতে হয়। এইভাবে রেশন থেকে চাল, গম আর চিনি নিয়ে সে বাড়ি ফিরে যায়। এই রুটিন চলেছিল প্রায় দু-বছর, ক্লাস নাইনে উঠে হস্টেলে না যাওয়া অবধি।

বহু দশক পার করে, স্মৃতির গভীর অন্দর থেকে এইসব ছবিগুলো ভেসে উঠল শ্রীলঙ্কার আর্থিক বিপর্যয়ে দিশাহারা মানুষের মুখগুলো দেখে। তারপর ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে গোটা বিশ্বজুড়ে গমের হাহাকার, প্রথমে ভারত থেকে নানান দেশে লক্ষ লক্ষ টন চাল গম রপ্তানি, তারপর হঠাৎ গম রপ্তানিতে ভারতের নিষেধাজ্ঞা জারিতে বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়ায় মনে মনে একটু গর্বই হল, না এখন আর আমাদের বিদেশের কাছে হাত পাততে হচ্ছে না, বরং অনেক দেশ আমাদের দিকে চেয়ে আছে। গুগল্ সার্চ করে দেখা গেল গত পঁচাত্তর বছরে দেশে গমের উৎপাদন বেড়েছে ১৬ গুণ আর চালের উৎপাদন ৫ গুণ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শ্রীলঙ্কা হঠাৎ এমন গাড্ডায় কেন পড়ল? এই কিছুদিন আগেও তো শ্রীলঙ্কা উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছিল। ২০১৮ সালে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৪০৫৮ মার্কিন ডলার। কিন্তু ২০২০ সালে অতিমারীর

পর থেকে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্র, পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর মতো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আমদানি এখন প্রায় বন্ধ। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির চাপে অসংখ্য মানুষ আবার দারিদ্র্যের পাঁকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। শ্রীলঙ্কার এই দুরাবস্থার একাধিক কারণ রয়েছে। চিনের কাছে শ্রীলঙ্কার দেনা আর অতিমারীর কারণে বিদেশী পর্যটক আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অর্থনীতি যে টালমাটাল হবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানিকারী দেশকে কেন তলানিতে ঠেকা বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার খরচ করে ৪৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চাল আমদানি করতে হবে এবং তারপরেও এর দাম প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে যাবে এটা বোঝা কঠিন। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির পেছনে রয়েছে তথাকথিত আদর্শবাদী এক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এক প্রয়োগ।

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপকসা ২০১৯ সালের নির্বাচনী প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দশ বছরের মধ্যে তিনি দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে পুরোপুরি জৈব পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করবেন। এই প্রতিশ্রুতির প্রকাশ আমরা দেখি **২০২১ সালের এপ্রিল মাসে যখন শ্রীলঙ্কা সরকার সমস্ত ধরনের রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং হার্বিসাইড আমদানি নিষিদ্ধ করে জৈব চাষের পদ্ধতি গ্রহণ করার নির্দেশ জারি করে।** এর ফল হল মারাত্মক। সব ধরনের কৃষি উৎপাদন মার খেলো। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকে নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে প্রথম ছয় মাসে ধানের ফলন স্বাভাবিকের চেয়ে আনুমানিক ২০ শতাংশ কম হয়েছে। সমস্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদন ১৯-২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। পেরাদেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিভিকা ভিরাহেভা ব্রিটিশ সংবাদপত্র দ্য টেলিগ্রাফ-কে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত ধানের উৎপাদন স্বাভাবিকের তুলনায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে।

এর ফলে একদিকে যেমন চা, মশলাপাতির মতো অর্থকরী রপ্তানিযোগ্য ফসল মার খেয়েছে, অন্যদিকে খাদ্য সংকটের জন্য চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রীলঙ্কাকে চাল আমদানি করতে হয়েছে। মনে রাখতে হবে, চা রপ্তানিতে শ্রীলঙ্কা পৃথিবীতে চার নম্বর। বার্ষিক আয় ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশে মোট চা উৎপাদন ৩.০০-৩.৫০ লক্ষ মেট্রিক টনের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে। শ্রীলঙ্কার বিশিষ্ট চা উৎপাদক রত্নাকর গুণারত্নে বলেছেন যে এই নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশের গড় বার্ষিক চা উৎপাদন অর্ধেকে নেমে আসবে। মোটামুটি হিসাব হচ্ছে জৈব সার সংক্রান্ত এই নীতির ফলে শ্রীলঙ্কার চায়ের রপ্তানি ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কম হবে। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর ডব্লিউ এ ভাইজেভ্রডন এই জৈব পদ্ধতি ব্যবহারের পরিকল্পনাকে 'একটি অবিশ্বাস্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বপ্নের বোঝা' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য এর ফলে শ্রীলঙ্কার খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে 'আপস' (কম্প্রোমাইজড) করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা এগ্রিকালচারাল ইকনমিকস্ অ্যাসোসিয়েশন ২৫মে ২০২১ রাষ্ট্রপতি রাজাপকসাকে চিঠি লিখে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলে— এর নেতিবাচক প্রভাব দেশের খাদ্য সুরক্ষা, কৃষিজ আয় বৈদেশিক মুদ্রা এবং গ্রামীণ দারিদ্র্যে পরিলক্ষিত হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল শ্রীলঙ্কার সরকার কেন এই আত্মঘাতী পদক্ষেপ গ্রহণ করল? এর উত্তর পেতে হলে একটু পেছনের দিকে তাকাতে হবে। জৈবিক কৃষি পদ্ধতির ধারণার সূত্রপাত ঘটেছিল ২০১৬ সালে, 'ভিয়াথমাগা' (Viyathmaga) নামে একটি নাগরিক সমাজ আন্দোলনের উত্থানে। অনুপ্রেরণায় রাজাপকসা। এদের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে পেশাদার (মানুষজন), শিক্ষাবিদ এবং উদ্যোগপতিদের সাহায্যে শ্রীলঙ্কার নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নয়নকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করাই তাদের লক্ষ্য। আসলে ভিয়াথমাগাকে রাজাপকসা তার নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম হিসাবে তৈরি করেছিলেন। বাস্তবে শ্রীলঙ্কার কৃষি বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশকে এই প্ল্যাটফর্মের বাইরে রাখা হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে ২০১৯ সালে নির্বাচনের পর রাজাপকসা তার মন্ত্রীসভায় একাধিক ভিয়াথমাগা সদস্যকে নিযুক্ত করেন। শ্রীলঙ্কার কৃষি মন্ত্রক নীতির বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শদাতা একধিক কমিটি তৈরি করে যেখানে দেশের কৃষি বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে সেখানকার জৈব কৃষি চর্চার (সমগ্র দেশে যার প্রসার নগণ্য) প্রতিনিধি এবং বিকল্প কৃষি ব্যবস্থার প্রবক্তাদের স্থান দেওয়া হয়। এছাড়া কমিটিতে উল্লেখযোগ্যভাবে ছিলেন মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রধান, যিনি দীর্ঘদিন ধরে দেশের উত্তর মধ্য প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে ক্রনিক কিডনি রোগের উপস্থিতির কারণ হিসাবে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও হার্বিসাইডের ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘদিন প্রচার করছেন। প্রথমত, এই রোগের কারণ নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে কোনো সিদ্ধান্তে

আসা যায় নি। দ্বিতীয়ত, এই অসুখ গোটা শ্রীলঙ্কার চাষিদের মধ্যে দেখা যায়নি। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই তা সীমাবদ্ধ। অথচ, গোটা দেশেই কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

জৈব পদ্ধতির ব্যবহার ২০১৯-র নির্বাচনী প্রচারের অঙ্গ হলেও, রাজাপকসা হয়ত বিনা প্রস্তুতিতে এমন হঠকারি সিদ্ধান্ত নিতেন না, যদি না চিনের ঋণ এবং কোভিডের কারণে পর্যটন থেকে রাজস্ব আদায় ও বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার তলানিতে না চলে যেত। হয়ত তার পরামর্শদাতারা বুঝিয়েছিল যে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের আমদানি বন্ধ করে জৈব পদ্ধতি গ্রহণ করলে বিদেশি মুদ্রার ঘাটতি অনেকটা হ্রাস পাবে। এর ফলে সার ও কীটনাশকের আমদানি বন্ধ করে যা সাশ্রয় হল তার অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বেরিয়ে গেল চাল আমদানি করতে। অন্যদিকে চা রপ্তানি কমে গেল। এ বিষয়ে গুণরত্ন সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন — 'যদি আমরা সম্পূর্ণ জৈব (পদ্ধতি) গ্রহণ করি, তাহলে আমরা ৫০ শতাংশ ফসল হারাবো, (কিন্তু) আমরা ৫০ শতাংশ বেশি দাম পাব না।' দ্বিতীয়ত, ওনার বক্তব্য অনুযায়ী জৈব পদ্ধতিতে চা চাষের খরচ ১০ গুণ বেশি, আর তার বাজারও সীমিত। বাস্তবে এতো বেশি দাম দিয়ে চা কেনার মতো অর্থ পৃথিবীতে কতজনের আছে?

অধিকাংশ সক্রিয় (activist) পরিবেশবাদীরা এই ব্যাপারটা বুঝতে চান না যে জৈব পদ্ধতিতে ৮০০ কোটি জনসংখ্যার পৃথিবীতে সকলের পেট ভরানো সম্ভব নয়। বিশেষত, যেখানে ৩৫০ কোটি মানুষের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNI per capita) চার হাজার মার্কিন ডলারের মধ্যে। সুস্থ পরিবেশ অবশ্যই কাম্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রাচীনকালে মানুষ কৃষি উৎপাদন বাড়াতো জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে নয়, কৃষি জমির বিস্তার ঘটিয়ে। আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে ৬০০ কোটি হেক্টর বনাঞ্চল ছিল। আজ সেটা দাঁড়িয়েছে ৪০০ কোটি হেক্টরে। এর মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ আমরা হারিয়েছি প্রথম ৫ হাজার বছরে। তখন পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫ কোটি। আর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারও ছিল সামান্য। যদিও জনসংখ্যা, গবাদি পশুর জন্য চারণভূমির চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলছিল তবু ১৯ শতকের শেষ পর্যন্ত আমরা ১০০ কোটি হেক্টর বনাঞ্চল হারিয়েছি। তখনও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১৬০ কোটি। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন যদি না বিপুল পরিমাণে বাড়ত, তাহলে আজ আর পৃথিবীতে এক হেক্টর বনাঞ্চল অবশিষ্ট থাকত না। অথবা দুর্ভিক্ষ আর অনাহারে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকত যেমন থেকেছে হাজার হাজার বছর ধরে।

শ্রীলঙ্কার দিকে তাকালে আমরা বুঝতে পারব সবুজ বিপ্লবের ফলে তার ধানের উৎপাদন কতটা বেড়েছে। ১৯৫০ সালে তার ধানের মোট উৎপাদন ছিল ৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন আর হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল ০.৯০ মেট্রিক টন। ১৯৯০ সালে মোট উৎপাদন দাঁনায় ২৩.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন আর হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয় ৩.১২ মেট্রিক টন। ২০১৮ সালে এই সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ৩০.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৪.৭৪ মেট্রিক টন। এই সবই হয়েছে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে।

দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, এইসব তথ্য জানা সত্ত্বেও সেই দেশের সরকার এমন একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারল। তবে সিদ্ধান্তটি অনেকের দ্বারা সমর্থিত ছিল, যার মধ্যে রয়েছে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর অর্গানিক ডিস্ট্রিক্টস, যারা শ্রীলঙ্কাকে জৈব জেলার একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতির সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছিল। জৈব চাষের দিকে শ্রীলঙ্কার স্থানান্তর স্থানীয় এবং বিদেশি গবেষক এবং কর্মীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। ৭ এবং ৯ জুন ২০২১ দুটি অনলাইন আলোচনা সভা হয়। প্রথমটির উদ্যোক্তা ছিল শ্রীলঙ্কার সরকারের প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যান্টেশন ম্যানেজমেন্ট। দুটিতেই ডক্টর বন্দনা শিবা অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন যে জৈব চাষ কোনো নতুন পদ্ধতি নয়, এটি শ্রীলঙ্কা সহ বহু দেশের ঐতিহ্যগত কৃষি পদ্ধতির একটি অংশ। তাঁর মতে, শ্রীলঙ্কার ১০০ শতাংশ জৈব দেশে পরিণত হওয়ার অর্থ হল সকলের জন্য স্থায়ী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, যা জলবায়ুকে অস্থিতিশীল করে না বরঞ্চ সমস্ত প্রজাতিকে রক্ষা করে।

শেষ পর্যন্ত, ২৪ নভেম্বর ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু এপ্রিল থেকে নভেম্বর, এই সাত মাস সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভূত ক্ষতি হয়ে গেছে। **আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা যে পরিবেশের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে, এটা কিন্তু কেউই অস্বীকার করে না। ভারত সমেত পৃথিবীর সব দেশই কিন্তু কিভাবে রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে জৈব পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক**

বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শে। ঠিক যেমন গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে সবুজ বিপ্লব সংগঠিত করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছিলেন। এ নিয়ে আলোচনা আগামী সংখ্যা জন্য তোলা রইল।

উল্লেখযোগ্য তথ্যসূত্র :

লেখার জন্য যে সব তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে, তার অধিকাংশ ইন্টারনেটে সার্চ করলে পাওয়া যাবে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নীচে দেওয়া হল :

১। *Deforestation and Forest Loss*
Deforestation and Forest Loss - Our World in Data
এটি অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবপেজ

২। *Investment Inducements to Public Infrastructure: Irrigation in the Philippines and Sri Lanka since Independence 1, January 2001 Table 1*
https://www.researchgate.net/figure/Development-in-rice-production-in-the-Philippines-and-Sri-Lanka-1950-95-a_tbl3_265248156

৩। *PADDY STATISTICS - EXTENT, SOWN, HARVESTED (GROSS & NET), AVERAGE YIELD AND PRODUCTION BY DISTRICT 2018/2019 MAHA SEASON*
www.statistics.gov.lk/Agriculture/StaticalInformation/PaddyStatistics/MetricUnits/IncludingMahaweli/2018-2019Maha

উ মা

ছোটদের ওপর অযথা খবরদারি

অরুণালোক ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া'। এই বাইরে দাঁড়ানোর বীজ বপন করার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়, শৈশব অবস্থা থেকেই। শিশুমনের অনাঘ্রাত মনজমিনে যে সব অভিজ্ঞতা এবং স্টিমুলাসের বীজ বপন করা হয়, তার ফসল ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে। সেই ফসলের ভালো-মন্দের ওপরে নির্ভর করে ভবিষ্যৎ মানুষ এবং সমাজের স্বাস্থ্য। এই বীজ লালন করে অঙ্কুরোদ্গম ঘটাতে গেলে, অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাটা খুব জরুরি। এই পরিবেশ দুই ধরনের। একটি বহিরঙ্গের, আরেকটি ভিতরমুখী। বাহ্যিক স্টিমুলাস অনেকটাই বস্তুগত। যেমন শারীরিক পুষ্টি বা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া। আর অন্তর্মুখী পরিবেশের বেশিরভাগটাই নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া। প্রতিনিয়ত নিজের সংস্কার ঘটিয়ে, অন্তরমহলের বেশিরভাগটাই নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া। প্রতিনিয়ত নিজের সংস্কার ঘটিয়ে, অন্তরমহলের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এই ঘষা-মাজার প্রক্রিয়াটি শৈশবের কোন বয়স থেকে যে শুরু হয় তার সুনির্দিষ্ট কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য নেই। তবে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে এটা বোঝা গেছে যে মানবজাতির মননের চারাগাছটি ডালপালা মেলতে থাকে গর্ভাবস্থা থেকেই। সুতরাং নবজাতকাল থেকেই বাহ্যিক উপাদানের সঙ্গে সঙ্গে পরিমিতি মানসিক স্টিমুলাসও জরুরি। এই স্টিমুলাসের পরিমাপটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে কিছুটা সময় দিতেই হয় নিজেকে চিনে নিতে। অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়েই নিজের মানবসত্তার বিকাশ ঘটে। উপনিষদে একেই বলা হয়েছে আত্মানাং বিদ্ধি। নিজেকে জানার এই সময়কালটাতে, বহিরঙ্গের অহেতুক জাঁকজমকপূর্ণ প্রভাব একেবারেই অনভিপ্রেত। অনাহূত এবং অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ শুধু যে শিশুর উপযুক্ত মানসিক বিকাশের বিঘ্ন ঘটায়, তাই নয় ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও অন্তরায় সৃষ্টি করে।

জীবনের প্রথম ভাগে সেল্ফ রিফ্লেকশন বা আত্ম প্রতিফলন হল শিশুমনন বিকাশের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই ধরনের কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করা হলে, শিশুদের আত্মসমীক্ষা, স্মরণশক্তি, অনুসন্ধিৎসা এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই শিশুরা ভবিষ্যতের কর্মজীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের মতো জটিল পরীক্ষাগুলিতে সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যায়। জীবনের নঞর্থক এবং ব্যর্থতালব্ধ অন্যান্য অভিজ্ঞতার সুচারু প্রয়োগ তাদের সফল চিন্তাবিদ হতে শেখায়। সেল্ফ রিফ্লেকশনের সফল প্রয়োগে, স্কুল এবং স্কুল-উত্তীর্ণ জীবনে শিশুদের একজন সফল নাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। আত্ম প্রতিফলনের উপকারিতাকে চার রকমভাবে প্রকাশ করা যায়।

১. আত্মসচেতনতা — সেল্ফ রিফ্লেকশনকে মানসিক বুদ্ধিমত্তা বিকাশের একটি মূল উপাদানও বলা যেতে পারে। এই প্রতিফলনের কাজটি শিশুদের আত্মোপলব্ধি ঘটাতে সাহায্য করে, তাদের পছন্দ-অপছন্দ বিচারের ক্ষমতা বাড়ায় এবং তাদের মানসিক দুর্বলতা ও শক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে একটা সামঞ্জস্য আনতে সাহায্য করে। এই পর্যায়ে শিশুদের বাহ্যিক কিছু পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এটি শিশুদের একটি শক্তিশালী আত্মবোধ গড়ে তোলে এবং নিজেদের জানতে ও বুঝতে সাহায্য করে। প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে, শিশুরা তাদের আনন্দ এবং সন্তুষ্টির জায়গা খুঁজে পায়। তারা বুঝতে পারে কোন জিনিসে তাদের আগ্রহ রয়েছে এবং কিসে তাদের অনাগ্রহ। এই ধরনের মানসিক চর্চায়, শিশুদের গণিত, ইংরেজি, কম্পিউটিং বা সাহিত্য-শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি সুপ্ত উৎসাহের উজ্জীবন ঘটে। শিশুরা নিজেদের পছন্দের বিষয়টিকেই চর্চার বিষয় করতে পারে। অনিচ্ছার বিষয় কপালের ফোঁটা হয়ে চড়চড় করে না। পছন্দের বিষয়টি জয়তিলক হয়েই শোভা পায়।

২. অপরকে চেনা --- সেল্ফ রিফ্লেকশন শিশুদের আত্ম-সচেতনতা বিকাশে যেমন সাহায্য করে, তেমনই অন্যদের বুঝতেও সাহায্য করে। বন্ধুবান্ধব, পরিবার এবং শিক্ষকদের সাথে মিথস্ক্রিয়া, শিশুদের অন্যান্যদের সাথে তাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ়ভাবে বুঝতে সাহায্য করে। পিতামাতা এবং শিক্ষকদের প্রশংসা, সমালোচনা এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়াতে শিশুমনের আহরিত অভিজ্ঞতা জারিত হয়। এই ধরনের পরিমিত এবং প্রয়োজনীয় স্টিমুলাস শিশুদের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়রকমের প্রতিক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতার প্রতিফলনের মধ্যে দিয়ে শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তাদের মনন পরিণত ও ঋদ্ধ হয়ে ওঠে।

৩. আত্মোন্নতি — পরিভাষায় 'Failure is the pillar of success' উক্তিটি শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিকূল পরিবেশ, অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা বা কঠিন চ্যালেঞ্জ শিশুদের এক সংশয়ের কিনারে দাঁড় করিয়ে দেয়। সে তখন তার বিদ্যমান সীমাবদ্ধতার বাইরে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হয়। শিশুরা তাদের জীবনে বিভিন্নরকম ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। সে খেলায় হেরে যাওয়া হোক, বন্ধু-বিচ্ছেদ হোক বা পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া যা-ই হোক না কেন। এসব ক্ষেত্রে তাদের দোষারোপ বা নিরাশ না করে, এই সমস্যার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে, ভবিষ্যৎ জীবনে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে, কিভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব সেই শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। ব্যর্থতাও যে ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্যের সোপান হয়ে উঠতে পারে, এই ধারণাটি অভিভাবকরা যত সুচারুরূপে শিশুমনে প্রোথিত করতে পারবেন, শিশুটি পরবর্তী জীবনে ততই সফল হবে। এই প্রক্রিয়াটি দু-ভাবে করা সম্ভব। প্রথমত খুব সাধারণ এক নৈমিত্তিক পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে অভিভাবকরা গল্পচ্ছলে বা সাধারণ আলাপের মাধ্যমে সংকট মোচনের উপায় নিয়ে শিশুদের মতামত জানতে পারেন। আর দ্বিতীয়ত, অনেকটা কেতাবি বা পোষাকি ঢং-এও এই ধরনের আলোচনা চালানো যেতে পারে। কাগজে সংকটকালীন মোকাবিলা সম্বন্ধীয় সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নাবলী শিশুদের দিয়ে দেওয়া হল। সেই লিখিত সমাধানগুলি পর্যালোচনা করে, শিশুদের কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যকরী উপদেশ দেওয়া হল।

৪. আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা — নিজেকে এবং অপরকে এই যে জানা এবং বোঝার প্রক্রিয়া, এটি একমাত্র সম্ভব সেল্ফ রিফ্লেকশন বা আত্ম প্রতিফলনের সফল প্রয়োগে। যে শিশু মানবচরিত্র যত ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে, সে ততই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। আত্মবিশ্বাসী সেই শিশুর মননে যখন বয়সের আস্তরণ পড়বে, সে ততই পূর্ণতা প্রপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে। লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস এই দুইয়ের মেলবন্ধন শিশুদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সাহায্য করে। ভুলের থেকে শিক্ষা নিয়ে, পরিচিত গণ্ডীর বাইরেও কিছু করার সাহস জোগায়। শিশুদের মানুষ করার বা বড় করে তোলার যে উপকরণগুলি আছে, তার অন্যতম প্রধান হিসাবে, এই সেল্ফ রিফ্লেকশন বা আত্ম প্রতিফলনকে অন্তর্ভুক্ত করাই হল সব অভিভাবকের আশু কর্তব্য। এই আত্মসমীক্ষাকে যদি অভ্যাসে পরিণত করা যায়, দৃঢ় মনস্ক সেই শিশুটি ভবিষ্যৎ জীবনের উত্থান ও পতনে মোটেই বিচলিত হবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়, 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা'।

সবশেষে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বলার দরকার, সেটি হল অভিভাবকদের সঠিক ভূমিকা কি হওয়া উচিত? শিশুদের শারীরিক এবং মানসিক এই দু-ধরনের বিকাশেই অভিভাবকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উদাহরণস্বরূপ খাদ্য এবং

পুষ্টির কথাই ধরা যাক। সদ্যোজাত অবস্থা থেকে শুরু করে, কৈশোর উত্তীর্ণ বয়স পর্যন্ত বিভিন্নরকম খাদ্য চয়ন করা, তার পুষ্টিগুণ, স্বাদ, বৈচিত্রকে মাথায় রাখা, পছন্দসই খাবারের স্বাধীনতা এবং সীমাবদ্ধতাকে গুরুত্ব দেওয়া— এতগুলো জিনিসকে মাথায় রাখা উচিত। অভিভাবকরা যদি এইসব স্মরণে রেখে, তাঁদের সন্তানদের খাদ্যাভ্যাস তৈরি করেন, তাহলে তারা সুষম আহারে অভ্যস্ত হবে। অপুষ্টি বা স্থূলতাজনিত সমস্যা হবে না। মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটিও অনুরূপ। অভিভাবকরা যদি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থাকেন, তাহলেও বিপদ। আবার শিশুদের মনের ওপর ক্রমাগত চাপের সৃষ্টি করলেও ঝামেলা। বাড়ির খুদেটি যেন অণু পরিবার বা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির কেন্দ্রবিন্দু। সবাই যেন চাইছেন তাঁদের বাড়ির শিশুটিই হোক সর্বশ্রেষ্ঠ। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই, পর্বতপ্রমাণ ইচ্ছার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় শিশুর অকর্ষিত মনজমিনে। বলাই বাহুল্য, ভালো হয় না। দিশেহারা শিশুটি পথভ্রষ্ট হয়। পরিমিত স্টিমুলাস দিয়ে, শিশুটিকে আত্মপ্রতিফলনের সুযোগ দিতে হবে। তার কচি মনের কিশলয়কে ডালপালা মেলার জায়গা দিতে হবে। তার অনুচ্চারিত আর্তি 'আপনমনে আমায় থাকতে দে না' অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই না শিশু দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে, সুস্থ সমাজের প্রতিভূ হয়ে উঠবে।

উ মা

ক্ষণজন্মা জ্যোতির্বিজ্ঞানী নারায়ণচন্দ্র রানা (১৯৫৪-১৯৯৬)

ষড়ানন পণ্ডা

মেদিনীপুর বেলদা থেকে কয়েক মাইল দূরে অখ্যাত গ্রাম শাউরি। এই গ্রামের একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। সে ঘরে রাতে চাঁদের আলো পড়ে। বর্ষায় হু হু করে জলের ধারা নেমে হড়পা বান ডাকে। এই গ্রামটা জগদ্বিখ্যাত হবে, এই গ্রামের একটি ছোট্ট শিশু বিশ্বের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদের সারিতে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বসবে একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। বলছি নারায়ণচন্দ্র রানা মানে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর নারায়ণচন্দ্র রানা, যিনি বড় বড় বিজ্ঞানীদের কাছে ডক্টর এন সি রানা নামে পরিচিত। শাউরি গ্রাম থেকে অনেক দূরে আমার বাড়ি। যে স্কুলে এন সি রানা পড়তেন ইচ্ছা আছে সেই স্কুলের হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে যদি আরো বেশি কিছু তথ্য পাই, তাও আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

বাবা রাজেন্দ্রনাথ, মা নাকফুড়ি। এই দম্পতির দুই ছেলে এক মেয়েকে নিয়ে ঝুপড়ি ঘরে বাস। রাজেন্দ্রবাবু হাঁপানি রোগী, বেশি পরিশ্রম করতে পারেন না। গ্রামের সংগতি সম্পন্ন বাড়িতে জন খাটা। এবং মা প্রতিবেশীদের বাড়িতে ঝি-গিরি করতেন। সন্ধ্যেবেলায় পুকুর পাড়ের শাকপাতা তুলে আনতেন। তাতে তো পেট ভরত না, ছেলেমেয়েগুলোর কোনও রকমে আধপেটা হত। ঘরে কেরোসিন ছিল না, উনুনের আবছা আলোয় পাড়ার দু-চারটি শিশু, যারা ছিল এই শিশুটির বন্ধু, রাজেন্দ্রবাবু সবাইকে একসঙ্গে প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ এবং ধারাপাত শেখাতেন। তখনকার দিনে ঠাকুর দেবতার নাম লোকে পছন্দ করত। রাজেন্দ্রবাবু ছেলের নাম রাখলেন নারায়ণ। কিন্তু সবাই বলত নারাণ। নারাণ ছিল যথেষ্ট বুদ্ধিমান। কোনও কথা একবার শুনলে সহজে মনে রাখতে পারত।

বাবা যখন ছেলেকে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে গেলেন, মাস্টারমশাই দু-একটা প্রশ্ন করে খুব সন্তুষ্ট হলেন। সোজা তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে নিলেন। মাস্টারমশাই বললেন, আপনি ওকে যা পড়িয়েছেন তাতে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়া ওর ভালোভাবে হয়ে গেছে। দু'বছর পরে ১৯৬৩ সালে শাউরি ভোলানাথ বিদ্যামন্দিরে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করা হল। আর ঠিক সেই বছরেই স্কুলটি

জুনিয়র হাই স্কুল থেকে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পতিতপাবন ভৌমিক স্বেচ্ছায় গ্রামেরই উচ্চশিক্ষিত যুবক শ্রীনিবাস নন্দকে প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত করে নিজে সহ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ওই বছর মণীন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী এবং আরো কয়েকজন শিক্ষক স্কুলে যোগ দিলেন। এই রুগ্ন নারায়ণ ছেলেটি মণীন্দ্রবাবুর খুব স্নেহভাজন হয়ে উঠল। সে অন্যান্য শিক্ষকদেরও নজর কাড়ল। মণীন্দ্রবাবু ক্লাসে অংক শেখাতে গিয়ে দেখলেন ছেলেটি দশমিক অংকের ভাগফল মুখে মুখে বলে দিচ্ছে, এমনকি দশমিক বিন্দুর পরপর দশটা সংখ্যাও বলে দিচ্ছে। ভূগোলের মাস্টারমশাই অবাক হলেন একটি বেল এনে মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছে স্যার পৃথিবীর আকৃতিটা বোধহয় উত্তর-দক্ষিণে একটু চাপা। ষষ্ঠ শ্রেণীতে নারায়ণ বৃত্তি পেল। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় বাবা রাজেন্দ্রবাবু মারা গেলেন। সংসার একেবারে অচল। বই কেনা সাধ্যের বাইরে। অন্য সহপাঠীর বই এনে খাতায় লিখে নারায়ণ পড়া মুখস্থ করত। সহ শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ সাউ বিধবা মায়ের সংসারের ভার নিলেন। নারায়ণকে স্কুল বোর্ডিংয়ে রাখার ব্যবস্থা হল। মণীন্দ্রবাবু নিজের হাতে একটি টেলিস্কোপ বানিয়েছিলেন। তাতে চোখ রেখে নারায়ণকে রাত জেগে আকাশ দেখাতেন। সেই কিশোর বয়স থেকেই নারায়ণ-এর আকাশের জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল।

অংকের মাস্টারমশাই চিত্তরঞ্জন দাসবাবুকে কঠিন কঠিন অংক দেওয়ার জন্য নারায়ণ অনুরোধ করত। প্রতিদিন নারায়ণ বাড়ি গিয়ে মা এবং ভাই-বোনেদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা জেনে আসত। ভাই বোন এবং মায়ের খোঁজ নিতে নারানের কোনও খামতি ছিল না।

১৯৬৯ সালে নারায়ণ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয় ও রাজ্যের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। সেই সঙ্গে শাউরি ভোলানাথ বিদ্যামন্দির রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে স্থান করে নেয়।

কিন্তু নারায়ণের সমস্যা কি করে মেটানো যায় এই নিয়ে শিক্ষক মশাইরা খুব চিন্তায় পড়লেন। মণীন্দ্রবাবুর দাদা জগদিন্দ্রবাবু কলকাতার একটি নামকরা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। উনি নারায়ণকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করালেন এবং খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হল বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস্ হোমে। এখানে নারানের কোনও খরচ লাগল না। অপুষ্টিতে নারায়ণ বেশ রোগা লিকলিকে। নারায়ণ অসুস্থ শরীরে প্রতিদিন বেলঘরিয়া থেকে ভিড়ে ঠাসা ট্রেনে যাতায়াত করত। কলেজ শেষ করে টিউশন পড়িয়ে বাসায় ফিরত। ভাই-বোনেদের খাওয়া পড়ার খরচ মায়ের হাতে নিয়মিত দিত। এরকম অমানুষিক পরিশ্রমে নারায়ণের স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়ল। সেদিন জানা গেল জন্মাবধি তার বুকের কঠিন অসুখ আছে। শাউরি হাই স্কুলের হেড মাস্টারমশাই নারায়ণকে গোপনে আর্থিক সাহায্য করতেন। নারায়ণ ভালো ছাত্র হওয়ার সুবাদে অনেক মাস্টারমশাই তাকে স্নেহ এবং ভালোবাসা দিয়ে বড় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অনার্স পেল নারায়ণ। ১৯৭৩ সালে পিওর ফিজিক্স নিয়ে পড়াশোনা করে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান দখল করে এমএসসি পাস করল। তাঁর স্পেশাল পেপার ছিল সলিড স্টেট ফিজিক্স।

কলেজের বিভাগীয় প্রধান প্রখ্যাত অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরী তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কলেজের আর একজন অধ্যাপক কবি বিষ্ণু দে। তাঁর পুত্রের সঙ্গে নারায়ণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। হয়ত সেইজন্য তিনি বিষ্ণুবাবুর অতীব স্নেহভাজন হতে পেরেছিলেন।

অমল রায়চৌধুরী নারায়ণকে টাটা ইন্সিটিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে পাঠান গবেষণা করার জন্য। সেখানে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার সহ পাঁচজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। সেখানে তিনি প্রত্যেকটি উত্তরের সঙ্গে একটি করে বিকল্প প্রশ্ন উপস্থাপন করে সকলকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তাঁর গবেষণাপত্র জমা পড়ে ১৯৮১তে। গবিষণাপত্রটির টাইটেল ছিল 'অ্যান ইনস্টিগেশন অফ দি প্রপার্টিজ অব ইন্টার গেলাক্টিক ডাস্ট'।

১৯৮৩তে ভারত সরকারের সংস্থা ইনসা (INSA) ডক্টর রানাকে তরুণ বিজ্ঞানী হিসেবে সম্মানিত করে। এই বছরে টিআইএফআর তাঁকে বছরের সেরা গবেষণাপত্রের রূপকার হিসাবে সম্মানিত করে। ১৯৭৮ সালে টিআইএফআর-এ থাকাকালীন তারা নিজেদের খরচে প্রথমবার নারায়ণবাবুর বুকে পেসমেকার বসিয়ে দেয়। পরে ডক্টর রানা যখন যুক্তরাজ্যের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় ব্রতী ছিলেন ১৯৮৪তে দ্বিতীয়বার নারায়ণবাবুর বুকে পেসমেকার বসানো হয়। ডারহাম থেকে তাঁকে 'বার্সারি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি টিআইএফআর-এ রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ছিলেন। পরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রফেসর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ডক্টর নারলিকার-এর উদ্যোগে পুনেতে গড়ে উঠল ইন্টার-ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স প্রতিষ্ঠানটি। এই প্রতিষ্ঠানের রিডার ছিলেন ডক্টর রানা। বিজ্ঞানী নারলিকার-এর স্বপ্ন ছিল বিজ্ঞানী ডঃ রানা একদিন নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী হবেন।

ডঃ রানা ১০০টি গবেষণাপত্র এবং ২০০টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ডঃ রানা ছিলেন কনফেডারেশন অফ দি ইন্ডিয়ান অ্যামেচার অ্যাস্ট্রোনমির প্রতিষ্ঠাতা এবং সায়েন্স টু ডে পত্রিকার সহ-সম্পাদক। এছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক দুটি বই — ১) আওয়ার সোলার সিস্টেম এবং ২) নাইটফল অন এ সানি মর্নিং।

পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আকাশগঙ্গা এলাকার একটি ঘরে ডঃ রানা থাকতেন। বিদেশের গবেষকদের এখান থেকেই গাইড করতেন। কম্পিউটার এবং বইপত্রের মধ্যেই তিনি ডুবে থাকতেন। এখানে থাকার সময় তিনি মহারাষ্ট্রের ২০০টি স্কুলে সায়েন্স ডে পালন, অ্যাস্ট্রোনমি বিষয়ক ব্যালে ও নৃত্যনাট্যর আয়োজন করতেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে আকর্ষণীয় করে তোলার নমুনা হিসেবে নারায়ণচন্দ্র রানার কিছু কাজ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

১৯৯৪-তে তৃতীয় তথা শেষবারের মতো পেসমেকার বসানো হয়। সেই বছরের শেষের দিকে খড়্গপুর আইআইটিতে লেকচার দেওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। তার শরীরের অবস্থা সবাই জানে। কিন্তু আধঘণ্টা দেরিতেও গাড়ি এল না। ডঃ রানা বড্ড বেশি সময়ানুবর্তী ব্যক্তি ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি রিক্সা করে অসুস্থ শরীরে বক্তৃতার হলে উপস্থিত হলেন। তখন ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি, কিন্তু সাড়ে চারটের সময়ে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল। তিনি কোনও ভূমিকা না করেই উত্থাপিত প্রশ্নগুলি উত্তর ব্ল্যাকবোর্ডের উপর চক-এর সাহায্যে সাবলীলভাবে এমন জাদু সৃষ্টি করলেন যে হল ভর্তি শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল তাঁর জোরলো কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যা তারা আগে কখনো শোনে নি। বক্তৃতাকালে কোনও চিরকুট দরকার হত না কোনদিন।

১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে ইটালি ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড প্রভৃতি সাতটি জায়গায় সেমিনার শেষ করে দেশে ফিরলেন ডঃ রানা। অকৃতদার সূর্যের মতো দীপ্ত এই বিজ্ঞানী নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি কখনো আনমনা হতে কেউ দেখে নি। ভগ্নস্বাস্থ্য, তারপর এই ছোটাছুটি সইতে পারল না। এত বিশাল তেজের অধিকারী সূর্য যেমন দিনের শেষে অস্তাচলে গমন করে, ডঃ রানা এত বড় প্রতিভার অধিকারী হয়েও মৃত্যুর কোলে একদিন ঢলে পড়লেন। ১৯৯৬-তে মাত্র ৪২টি বছরের জীবনে বিজ্ঞান সাধনার শিখরে আরোহণ করে আমাদের সকলকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে অজানা দেশে পাড়ি দিলেন এই বিরল প্রতিভার মানুষটি।

এই লেখাটিতে কোনও বই ও গুগল্-এর সাহায্য নেওয়া হয় নি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা থেকে সংগৃহীত। — লেখক

উ মা

বিশেষ ঘোষণা

উৎস মানুষ-এর প্রতিটি সংখ্যা গ্রাহকদের দেওয়া ঠিকানায় বুক-পোস্ট করা হয়, যার প্যাকেটের মুখ খোলা থাকে। পোস্ট-অফিস থেকে বুক পোস্ট-এর কোনো রসিদ দেওয়া হয় না। পত্রিকা পেতে দেরি হয় বলে কোনো কোনো গ্রাহক স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পার্সেলে পত্রিকা পাঠাতে বলেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা বাড়তি ডাক খরচ পত্রিকার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেন। সাধারণ ডাকে পাঠানো পত্রিকা না পেয়ে কোনো কোনো গ্রাহক পত্রিকা পাঠাবার প্রমাণস্বরূপ ডাক বিভাগের রসিদ চান। এই পরিস্থিতিতে আমরা কিছু বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ভেবেছি। যে সব গ্রাহক সাধারণ ডাকে পত্রিকা নেন তাঁদের জন্য গ্রাহক চাঁদা একই থাকছে। অর্থাৎ বছরে ১৫০ টাকা। আর যাঁরা স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পার্সেলে পত্রিকা নিতে চান তাঁদের জন্য গ্রাহক চাঁদা ২২০ টাকা (বছরে চারটি সংখ্যার জন্য) ধার্য করা হয়েছে। প্রিয় গ্রাহক, বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। উৎস মানুষ জানুয়ারি ২০২৩ সংখ্যা থেকে নতুন ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। — উৎস মানুষ পরিচালকমণ্ডলী

সাগরদ্বীপে আর এক মন্দির

দীপকরঞ্জন মন্ডল

সাগর সঙ্গমে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা নদীর মোহনায় জীববৈচিত্র্য ও অতুল ঐশ্বর্যে ভরপুর বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ সুন্দরবন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য, কৃষি, মৎস্য, পর্যটন, সমুদ্রের সঙ্গে নদী বন্দরের সংযোগসাধন সহ নানা ক্ষেত্রে সুন্দরবনের ভূমিকা অমূল্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত সাইক্লোনের হাত থেকে এ দেশ বাঁচানোর এক অতন্দ্রপ্রহরী সুন্দরবন। সুন্দরবন শুধু সুন্দরী গাছের বন নয়, আধুনিক সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার এক 'সুন্দর বন্ধু'। সমগ্র সুন্দরবনের মাত্র ৩৫ শতাংশ ভারতে আর বাকিটা বাংলাদেশে। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবনের গহীন অরণ্য অঞ্চলে ব্যাঘ্র প্রকল্পের সূচনা হয়। ১৯৯২ সালে সুন্দরবনকে রামসার কনভেনশন কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জলাভূমি রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৭ সালে UNESCO সুন্দরবনকে World Heritage Site হিসেবে চিহ্নিত করে। ২০০১ সালে নীলগিরির পরে সুন্দরবন দ্বিতীয় বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বিভিন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী, পাখি, মাছ, সরীসৃপ ও উভচর প্রাণী, বিভিন্ন জলজ ও লবণাম্বু উদ্ভিদের আবাসস্থল সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ জলাভূমি। প্রতি বছর শীতকালে নানান প্রজাতির অতিথি পাখির আগমনও ঘটে এখানে। ভারতের মোট ১০২ দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি জনবসতি অধিকৃত। জনবসতিসম্পন্ন দ্বীপের মধ্যে সাগরদ্বীপটি সবার থেকে বড়। সাগরদ্বীপের প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণটি হল কপিলমুনির মন্দির। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তি তিথিতে যে পুণ্যমেলার আয়োজন হয় তার পরিধি কুম্ভমেলার ঠিক পরেই। আজ থেকে ৫৬ বছর আগে এই সাগর দ্বীপেই স্থাপিত হয় এক অন্য ধরনের মন্দির। আজ আমরা যে জীব বৈচিত্র্যের কথা ব্যাপক হারে শুনি তা কিন্তু ১৯৬৬ সালে শোনা যায় নি। ১৯৮৫ সালে Walter G.Rosen "Biological Diversity" শব্দ যুগলকে 'Biodiversity' শব্দ গুচ্ছে প্রথম প্রকাশ করেন যা কোন নির্দিষ্ট স্থানে আপামর অণুজীব হতে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহকে নির্দেশ করে। বাস্তুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় এদের ভূমিকা একে অপরের পরিপূরক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরী তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেননি, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক মাত্র। ষাটের দশকে কলেজ পরিসরে যে শুধু গবেষণা নয় পিএইচডি গাইড হিসেবে পরিচালনা করা যায় অন্তত প্রাণিবিদ্যায় তার প্রথম উদাহরণ অধ্যাপক চৌধুরী। তাঁর নিজের পিএইচডি-র বিষয় ছিল রোমন্থনকারী প্রাণীর পাকস্থলীর অণুজীব ও বিপাকে এদের ভূমিকা। কলেজে প্রাণিবিদ্যা শিক্ষণে একটি বিশেষ অংশ ছিল এক্সারসনের মাধ্যমে ফিল্ড স্টাডিজ। সেই সূত্রে ১৯৬৩ সালে অধ্যাপক চৌধুরীর প্রথম সুন্দরবনে যাওয়া আর স্থানটি ছিল লোথিয়ান আইল্যান্ড। সাগরদ্বীপ তথা সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যের অমোঘ আকর্ষণে বারে বারে যাতায়াত চলতে থাকে দ্বীপের আনাচে কানাচে। তাঁর উপলব্ধি হয় সুন্দরবন এক জীবন্ত প্রাকৃতিক গবেষণাগার, অনেক না দেখা না জানা জীবের আবাসভূমি। বাস্তুতন্ত্রে প্রতিটি জীবের ভূমিকা অনন্য ও স্বতন্ত্র। সাগরের শুভ্র ফেনিল ঊর্মি লহরী এবং দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশি, সাগর সঙ্গমে আর দ্বীপের বিপুল অনাবিষ্কৃত জীববৈচিত্র্যের উপর গবেষণার আকর্ষণে সাগরদ্বীপে তিনি একটি গবেষণাগার গড়ে তোলার সংকল্প করেন। সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে অনন্য মাতৃভক্ত অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরী মায়ের নামে উৎসর্গ করে ১৯৬৬ সালে স্থাপন করেন সুষমা দেবী চৌধুরানী মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

১৯৬৯ সালে অধ্যাপক চৌধুরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলজি বিভাগে যোগ দিলেন। সাগরদ্বীপে মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করা মানে এটা নয় যে তাঁর পঠন, শিক্ষণ ও গবেষণার পুরো বিষয়টি ছিল সুন্দরবনকেন্দ্রিক। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে তাঁরই পিএইচডি-র গাইড অধ্যাপক মুকুন্দ মুরারি চক্রবর্তীর প্রটোজুলজি ল্যাবরেটরিতে নতুন করে কাজ শুরু করলেন কিন্তু পড়ানোর সীমারেখা প্রোটোজোয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল না। যতদূর মনে পড়ে ক্ল্যাসিক্যাল জুলজি পড়াতেন দুজন শিক্ষক— অধ্যাপক অজিতকুমার সরকার আর অধ্যাপক চৌধুরী। বিষয় ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে দুজনেরই সবক্ষেত্রে নিজস্বতা ছিল। অধ্যাপক চৌধুরী এমন কিছু বিষয় বেছে নিতেন যার মধ্যে পুরানোপন্থী তাত্ত্বিক যেমন হেক্লে ও

ল্যামার্ক প্রভৃতির প্রসঙ্গ অবধারিত ছিল। ফলে তাঁরই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ছিল হয়তো বা পরীক্ষামূলক গবেষণায় অধ্যাপক চৌধুরীর কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যেত যে সায়েন্স কলেজে তখন তাঁর নির্দেশনায় ট্রাইপ্যনোসোমা নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণার কাজ চলছে। একজন সফল গবেষক সফল শিক্ষক হবেন এই তত্ত্বটি সব সময় খাটে না। অধ্যাপক চৌধুরী এই দুই ক্ষেত্রকে কখনো একই তুলাদণ্ডে মাপেন নি, ঠিক এই কারণে তাঁর জনপ্রিয়তা সাধারণ ছাত্র আর গবেষক ছাত্র কোনো দলের মধ্যে কিছু কম ছিল না। সুষমাদেবী চৌধুরানী মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে যে কাজগুলো হয়েছে সে দিকে নজর দিলে কাজের বহুমাত্রিকতার পরিচয় পেতে অসুবিধা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ও সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'শ্রীখণ্ড সুন্দরবন' (সম্পাদক দেবপ্রসাদ জানা, ২০০৪) বইটিতে অধ্যাপক চৌধুরীর চোখে সুন্দরবন এক মুক্তাঙ্গন নাট্যমঞ্চ। নদী মেখলা সুন্দবনের চিরহরিৎ ম্যানগ্রোভ বনানী আর ম্যানগ্রোভ আশ্রিত অদৃষ্টপূর্ব জীববৈচিত্র্য বিশ্বের বিস্ময়। সুন্দরবনের স্থল জল বনতলে যত প্রাণসম্ভার রয়েছে দৃশ্য বা অদৃশ্য উদ্ভিদ বা প্রাণী সকলেরই দৈনন্দিন জীবনযাপন, কাজের রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় চন্দ্র সূর্যের অমোঘ আকর্ষণ বিকর্ষণে, প্রতি চান্দ্রপক্ষের তিথি নির্দেশে। জীবনচক্রের প্রতিটি পদক্ষেপ আবর্তিত হয় তিথি অনুযায়ী জোয়ার ভাঁটার তালে তালে ছন্দায়িত ঘড়ির কাঁটার চলনে। এই মুক্তাঙ্গনে প্রতিটি দৃশ্যপট যেমন বালুতট বা littoral (উচ্চতট বা super littoral, মধ্যবর্তী তট বা mid littoral এবং নিম্নতট বা lower littoral), পলিতট বা mudflat (দ্বীপের মধ্যে খাঁড়ি বা tidal creek), এবং উন্মুক্ত পলিতটের পটভূমি স্বতন্ত্র ও অনন্য। এখানেই চৌধুরীর গবেষণায় পাওয়া গেছে অনেক নতুন প্রাণীর সন্ধান। এর মধ্যে একটি নতুন প্রজাতির সাগরকুসুম *Pelocoetes sagarensis*, সাধারণ নাম দিয়েছেন গ্লাস অ্যানিমোন। Hemichordate-এ অন্তর্ভুক্ত প্রাণীরা একটি বিশেষ ধরনের অমেরুদণ্ডী প্রাণী। দক্ষিণ ভারতের মান্নার উপসাগরের জীবপরিমণ্ডলে প্রবাল বালুতটে এই ধরনের যে প্রাণীটির তথ্য জানা ছিল তা হল *Ptychodera palva*. সুন্দরবনের পলি মাটিতে এই ধরনের প্রাণীর অস্তিত্বের কথা অধ্যাপক চৌধুরীর আবিষ্কারের আগে জানা ছিল না। সাগরদ্বীপের সম্মানে এটির নামকরণ করা হয় *Saccoglassus sagarensis*. পৃথিবীর অন্য কোনো ম্যানগ্রোভ পরিবেশে এদের অস্তিত্বের উল্লেখ নেই। আর এক আদিম সামুদ্রিক প্রাণীর কথা উঠে আসে অধ্যাপক চৌধুরীর গবেষণায়। সেটি হল Nemertinia প্রভুক্ত প্রাণী। এই প্রাণিগোষ্ঠীটির আবির্ভাব হয়েছিল সমুদ্র পরিবেশে প্রায় একশ কোটি বছর আগে। এদের সমসাময়িক অনেক প্রাণিকুল পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। এই প্রাণিকুলের দুটি শ্রেণীর সনাক্তকরণের কাজ করেন অধ্যাপক চৌধুরী।

আর এক কম জানা প্রাণীর কথা উঠে আসে অধ্যাপক চৌধুরীর গবেষণায়। তা হল সুন্দরবনের পাতালবাসী এক চিংড়ির কথা। চিংড়ির রকমফের হরেক রকম। ছোট চিংড়ি স্রিম্প, বড় চিংড়ি প্রন আরো বড় চিংড়ি লবস্টার। প্রায় ৩০টি প্রজাতির চিংড়ি সুন্দরবনের পাওয়া যায়। এদের প্রায় সব কটাই সুন্দরবনের জলে জঙ্গলে পাওয়া যায়। সবাই জলের কোথাও না কোথাও বাস করে। তবে যে চিংড়ি নিয়ে কথা বলব বলে ভেবেছি তা আমাদের দেশে রসনা বিলাসের কারণে নয়। আরো মজার কথা হল যে জল নয় বরং এদের সাম্রাজ্য পাতালে। পাতাল বা গর্তে থাকে এরকম প্রাণীর কথা উঠলে প্রথমেই মনে পড়ে মেঠো ইঁদুরের কথা। এদের গর্ত খোঁড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রতিভার আভাস মাটির উপর থেকে বোঝার উপায় নেই। সাগর তটে বেড়াতে গিয়ে লাল কাঁকড়ার কমরেডদের আমরা দেখি নি তা তো নয়। কিন্তু একটা কাঁকড়া ধরতে যাও, নিমেষেই ফুড়ুৎ করে গর্তে ঢুকে যাবে। সমুদ্রতটে আরো অনেক গর্তবিলাসী প্রাণীর কথা আমরা জানি আর প্রত্যেকেরই গর্তগৃহ কারিগরি বৈচিত্র্য ভিন্ন ধরনের। বাংলায় প্রাণীটির নাম পাতাল চিংড়ি, ইংরেজিতে এটিকে mud lobster বা scorpion mud lobster বলা হয়। খানিকটা কাঁকড়াবিছের মতো দেখতে বলেই লবস্টার-এর সাথে স্করপিয়ন কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাণীজগতে পাতাল চিংড়ির প্রথম বর্ণনা ও অবস্থান নির্ণয় করেন J F W Herbst ১৮০৪ সালে কিন্তু তা ছিল সংক্ষিপ্ত। পাতাল চিংড়ির খোঁড়া মাটির ঢিপি দেখে মাটির নীচে তিনি অবস্থান করছেন এটা বোঝা কোনো কঠিন কম্ম নয়। কিন্তু মাটি খুঁড়ে তাকে বের করে আনা সত্যি রকেট বিজ্ঞানের মতোই কঠিন কাজ। গোলকধাঁধা বললেও কম হবে এমনই গলির রাজ্যে মাটির প্রায় তিন মিটার অবধি গভীরতায় এরা বাস করে। অন্ধগলির আঁধারে থাকে বলেই অন্যান্য চিংড়ির

তুলনায় এদের চোখের জ্যোতি ক্ষীণ। তাই mud lobster সংগ্রহ করে রেস্তোঁরায় নিয়ে আসার জন্য বাঁশের চোং দিয়ে তৈরি এক বিশেষ ফাঁদ ব্যবহার করা হয়। এই প্রাণীটি নিয়ে কাজ করার এখনো অনেক সুযোগ আছে, যা অধ্যাপক চৌধুরীর অসম্পূর্ণ কাজের তালিকায় পড়ে।

সুষমা দেবী চৌধুরানী মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে ম্যানগ্রোভের জলে জঙ্গলে কাজ হবে এটা স্বাভাবিক, তা বলে ব্যাঘ্রপ্রকল্পের কোর এরিয়া যে ব্রাত্য ছিল তা নয়। সাতের দশকের শেষ দিকে দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড কলেজ থেকে পাওয়া এক প্রজেক্টে সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী রোগ জীবাণু অনুসন্ধানের কাজ প্রায় তিন বছর ধরে চলেছে। UGC, ICAR, CSIR, DST, DBT প্রভৃতি অনুদান মঞ্জুরি সংস্থা থেকে পাওয়া ২৬টি রিসার্চ প্রজেক্টের মুখ্য বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেন অধ্যাপক চৌধুরী। পঞ্চাশ বছরের কর্মজীবনে তাঁর তত্ত্বাবধানে ৬৭জন পিএইচডি-র কাজ করেন, এর মধ্যে ৪৭ জনের বিষয় ছিল সুন্দরবন সম্বন্ধীয়। দেশে বিদেশে সমাদৃত গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা ৩০০-রও বেশি। সব কটি প্রজেক্টের কথা বলা সম্ভব নয়, দুটির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। ১৯৭৯ সালে DST থেকে একটি প্রজেক্ট আসে, তাতে জুলজি, বোটানি, কেমিস্ট্রি ও জিওলজি থেকে ১১ জন স্কলার কাজের সুযোগ পায়। সঙ্গে চলতে থাকে বিভিন্ন আঙ্গিকের গবেষণা পত্রের প্রকাশনা। কাজের সুবিধার জন্য ছিল একটি মোটর ভেসেল ও জিপ গাড়ি। ফিল্ড ওয়ার্কের সুবিধার জন্য মোটর ভেসেলে একটি ভাসমান ল্যাবরেটরিও যোগ করা হয়েছিল। ভেসেলটির নাম দেওয়া হয়েছিল সাগরপুত্র। অধ্যাপক চৌধুরীর ইচ্ছে ছিল এটির নাম হোক সাগরকন্যা। কিন্তু ঠিক একই সময়ে গোয়ার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ওসেনোগ্রাফির একটি ভেসেলের নাম দেওয়া হয়েছিল সাগরকন্যা। তাই সাগরপুত্র নামটি শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরের পর ১৯৯৮ সাল থেকে সুষমা দেবী চৌধুরানী মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রজেক্টে গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।

তাঁর গবেষণায় সমুদ্র ও সুন্দরবনের জলাভূমি থেকে উঠে এসেছে বেশ কিছু মূল্যবান জ্ঞানের সম্ভার। তারই কিছু নমুনা হল — নীলাভ সবুজ অণুশৈবালের পরিবেশের প্রয়োজনে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ ক্ষমতার মূল্যায়ন; রক্তঝিনুকের (*Anadera granosa*) রক্তে তিন ধরনের লেকটিনের সনাক্তকরণ; ডাকুর মাছ (Mud skipper) এবং শঙ্কর মাছে (Sting ray) বিশেষ ধরনের জৈবক্রিয় লিপিড বস্তুর সনাক্তকরণ; রাজকাঁকড়ার (*Carcinoscorpius rotandicauda*) নীল রক্তে অ্যামিবোসাইট লাইসেটের আবিষ্কার এবং যার পেটেন্ট নেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে এটিও লক্ষ্য করার বিষয় যে সুন্দরবনে আবিষ্কৃত কিছু প্রাণীর নামকরণ করা হয় অধ্যাপক চৌধুরীর সম্মানে। কয়েকটি উদাহরণ হল — *Lycosa choudhuryi* (মাকড়সা), *Parasarcophaga choudhuryi* (এক ধরনের মাছি), *Cyathoshiva amaleshi* (মুক্তজীবী কৃমি)। কাজের সূত্রে দেশি-বিদেশি সংস্থার সাথে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল এবং যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে চেয়ারম্যান/সদস্য হিসেবে অবদান রেখেছেন তার কিছু নমুনা: Hony. Warden & Expert Member, Wildlife Advisory Board WB; Sundarban Development Board WB; National Mangrove Committee GoI; Deep Sea Bengal Fan, GoI, National Institute of Oceanography, CSIR ইত্যাদি। কর্মসূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ সম্মাননাগুলি হল: Fellow of National Academy of Sciences (India); Fellow of Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (London) আরও অনেক সম্মাননা। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ হিসেবে অধ্যাপক চৌধুরী শেষ যে মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন তা হল কলকাতায় আইটিসি সোনার বাংলায় আয়োজিত "Living Deltas Hub" শিরোনামে এক আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচি। আয়োজক ছিল Global Challenge Research Fund, UK Research & Innovations এবং Newcastle University।

প্রশাসনিক কাজে ছিল তাঁর চরম অনীহা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলজি বিভাগে বিভাগীয় প্রধানের পদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন নি তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরিন সায়েন্স বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অনিবার্য কারণেই বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। অহংবোধ নিজের সাফল্যের কথা বলছেন এরকম কোনোদিন শুনি নি, কিন্তু মুখমণ্ডল তৃপ্তির আভায় উদ্ভাসিত হতে দেখেছি যখন তিনি বলতেন তাঁর কোন কোন ছাত্র কোথায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কে কোথায় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আছে, কোন ছাত্র জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর, কোন ছাত্র

বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান বা কোন ছাত্র কোন গবেষণা কেন্দ্রে কি রকম কাজ করছে। এ যেন মহাভারতের অর্জুনের বীরত্বের প্রকাশ নয় বরং অর্জুনের কাছে পরাজিত গুরুদেব দ্রোণাচার্যের অহংকার। কোন কাজটি হয়েছে তা অধ্যাপক চৌধুরীর কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কিন্তু অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন সেই সমস্ত কাজ নিয়ে যেখানে অনেক সম্ভাবনা আছে অথচ অবহেলিত। ১৫ এপ্রিল ২০১৫ সালের 'শুধু সুন্দরবন চর্চা'য় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তার মনের এই দৃষ্টিকোণের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। ''(সাগরদ্বীপে) চাঁপাতলা মন্দিরতলা বলে একটা জায়গা আছে সেটা গ্রাম থেকে পাঁচ কিলোমিটার খুব সুন্দর জায়গা। ...ওখানে পাশেই এক মন্দির আছে। ওখানে একটা আরকিওলজিক্যাল সেন্টার গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। খুব তাড়াতাড়ি ওখানে একটা টুরিস্ট ডেস্টিনেশন হবে...'' ১৯৬৬ সালের এক ঘটনার (আসলেই দুর্ঘটনা, এই স্থানে ফিল্ড ওয়ার্ক করাকালীন মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন) প্রসঙ্গে টুরিস্ট ডেস্টিনেশনের কথা বলেছিলেন। কাজটি হয় নি, কোন সংস্থাই কোন গুরুত্ব দেয় নি, এ নিয়ে জীবন সায়াহ্নেও অধ্যাপক চৌধুরীর চোখেমুখে ভাবনার ছায়া দেখেছি। ১৯৬৬ সালের সাগর আর আজকের সাগরদ্বীপ যে এক নয় তা বুঝতে কারুর কোনো অসুবিধা নেই। সেদিনের প্রচলিত প্রবাদটি 'সব তীর্থ বারবার সাগর তীর্থ একবার', তা সে কপিল মুনির আশীর্বাদই হোক বা বিশ্বায়নের প্রভাবেই হোক, আজকের দিনে কোনোভাবেই খাটে না। না, মন্দিরতলায় কোনো ডেস্টিনেশনই গড়ে ওঠে নি, কালের গর্ভে সেই মন্দির হয়তো হারিয়ে গেছে, অথচ নিজের বৈজ্ঞানিক বৃত্তের বাইরে আজ থেকে ৫৫ বছর আগে সাগরে টুরিস্ট ডেস্টিনেশনের ভাবনা আরো কোন মানুষের মস্তিষ্ককে উদয় হয়েছিল কিনা সত্যিই সন্দেহ।

সুন্দরবন নিবেদিত বিজ্ঞান পুরোহিত অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরীর জন্ম ১৯৩১ সালের ১১ জুন কোভিড সংক্রমণে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর। রেখে গেলেন সাগরদ্বীপে আরেক মন্দির সুষমা দেবীচৌধুরানী মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিউট। আমরা কি পারব তাঁর অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে?

উমা

ডাইনি সমস্যা : একটি সামাজিক ব্যাধি

পূর্ণিমা সাহা

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরোর তথ্য থেকে জানা যায়, ২০১৫ সালে ভারতে ডাইন বা ডাইনি সন্দেহে একজন খুন হয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন এ বিষয়ে উদাসীন। (ডিসেম্বর ৪, ২০২০, অন্যছবি.কম)। ২২ জানুয়ারি, ২০২০ সিমলা, বাঘমুণ্ডিতে 'ডাইনি' সন্দেহে একজন বৃদ্ধাকে শারীরিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রহার করে। পীড়িতার পুত্রবধূ ও কন্যা তাকে বাঁচাতে এলে তাঁরাও গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় (মে ২০, ২০২০, অন্যছবি.কম)। একুশ শতকের সভ্য সমাজে 'ডাইনি' নামে আজও নারীদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু এর শিকড় প্রোথিত রয়েছে সুদূর অতীতে, যা আজ পর্যন্ত সমাজ থেকে নির্মূল করা যায় নি।

'ডাকিনী' শব্দের উৎসমূল অনুসন্ধানে জানা যায়, ডাইনি 'উপদ্রবকারিণী নারী' অথবা 'পিশাচ'। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ প্রাকৃতিক বিরুদ্ধ শক্তিকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করে তাকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। এই দানবীয় শক্তিকে করায়ত্ত করার প্রয়োজন ও বাসনা থেকে যাদুবিদ্যার উদ্ভব হয়। ডাইনি-বিদ্যার সৃষ্টির উৎসমূলে রয়েছে তন্ত্রসাধনা। তন্ত্রসাধনায় ষটচক্রের ছয়জন অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মধ্যে ডাকিনী হলেন অন্যতম। 'ডাক' শব্দটি তিব্বতি, যার অর্থ হল জ্ঞানী, এরই স্ত্রীলিঙ্গে ডাকিনী শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তন্ত্রমতে 'ডাকিনী' শব্দটির মূল অর্থই হল 'গুহ্য জ্ঞানসম্পন্না'। বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্র ডাকিনীর উল্লেখ রয়েছে। প্রচলিত আছে যে, মানুষের সঙ্গে শয়তানের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে কথাবার্তা হয় এবং শয়তান এই কার্যকলাপ চরিতার্থ করতে যে পদ্ধতির অনুসরণ করে, তাই ডাকিনী তন্ত্র। নৃত্য, ভোজ, মন্ত্রোচ্চারণ এই তন্ত্রের আবশ্যিক অঙ্গ। এই তন্ত্রের ইতিবাচক দিক হিসাবে শস্য উৎপাদন, শত্রু নিবারণ, বন্ধ্যা নারীকে সন্তানধারণে সক্ষম করে তোলা ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এই ইতিবাচক দিক অপেক্ষা নেতিবাচক দিককে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। সুতরাং সমাজে কোনো অমঙ্গল সাধিত হলে, তা ডাইনির প্রকোপ বলে সন্দেহ করা হয়।

আত্মায় বিশ্বাস বিভিন্ন আদিম ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম। যে সময় চিকিৎসার উন্নত ব্যবস্থা ছিল না, আধিভৌতিক শক্তিকে বশ করার জন্যে তুক-তাক, মাদুলি, কবচ প্রভৃতি গুণিন বা ওঝার নির্দেশক্রমে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করা হত। এই বদ্ধমূল ধারণা ক্রমে কুসংস্কারে পরিণত হয়। বিশেষভাবে গ্রামীণ সমাজে এই ধারণা আজও বর্তমান। লক্ষণীয় যে, ডাইনি স্ত্রীলিঙ্গসূচক। সুতরাং নারীকে লক্ষ্য করেই, তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। অশিক্ষিত

সমাজে এই কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে ধূর্ত লোকেরা তাদের কার্যসিদ্ধি করতে সক্ষম হয়। একের পর এক নারী আজও এই কুসংস্কারের বলি হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার মালদা, দিনাজপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের অসংখ্য ডাইনি হত্যার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে শুধুমাত্র মালদা জেলাতেই সরকারি হিসাবে ৯৬টি ডাইনি হত্যা হয়েছে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ইউরোপেও ডাইনি শিকারের ছলে প্রতিনিয়ত হয় নারী হত্যা। ১৪০০ থেকে ১৭০০-র মধ্যে ইউরোপে ৫ লাখ নিরপরাধ নারীকে হত্যা করা হয়। ধর্মের ধ্বজাধারী পুরোহিতরা সমাজের বিধি লঙ্ঘনকারী এই সমস্ত নারীদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে। প্রকৃতপক্ষে তারা পুরুষ। অর্থের অভাবে অর্থোপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে নারীরা এই ধরনের কার্যকলাপকে ধর্মের ধ্বজাধারীরা সহজে মেনে নিতে পারে নি। সেজন্য সমাজের চোখে তাদের ডাইনি বানিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

অশিক্ষিত বর্বর আদিবাসীরা প্রাকৃতিক অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে ভূত-প্রেত, তুকতাক ডাইনিরূপ অপদেবতায় অগাধ বিশ্বাস রাখে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে হো, সাঁওতালি, খোন্দ জনজাতি উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল সমাজে ডাইনি বিশ্বাস অত্যন্ত প্রগাঢ়। অশুভ শক্তির প্রতীক হিসাবে ডাইনি থাপল বোঙ্গার স্ত্রী। তাদের সমাজে 'জানগুরু'র নির্দেশেই কোনো একজন সাঁওতাল নারী ডাইনি বলে চিহ্নিত হয়। জানগুরু সাঁওতাল সমাজে তন্ত্র সাধনায় পারদর্শী। সখা ও ওঝারাও তান্ত্রিক সাধক হলেও জানগুরুর মতো প্রভাবশালী নয়। তাদের ধারণা নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী এবং শারীরিক অসুস্থতার কেন্দ্রমূলে রয়েছে ডাইনির প্রকোপ। ডাইনি সনাক্তকরণের জন্য তিনটি দলে ভাগ হয়ে তার তিনজন ওঝার শরণাপন্ন হয়। ওঝারা শালপাতায় তেল ঢেলে মন্ত্র পাঠ করে একজন সাঁওতাল নারীকে ডাইনি সাব্যস্ত করে। কারোর প্রতি প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য সমাজের পুরোধা হিসাবে বিবেচিত জানগুরুদের টাকাপয়সা দিয়ে, নির্দিষ্ট কাউকে ডাইনি সাব্যস্ত করে তার জীবন ধ্বংস করা হয়। সাঁওতাল সমাজে কঠোর সামাজিক ব্যবস্থায় ঈশ্বর পুজোতেও নারীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। সাঁওতালদের মধ্যে একটা বড় অংশ ডাইনি প্রথা সম্বন্ধে সচেতন হলেও সামাজিক নেতৃত্বের এই পরিকাঠামোটি আজও অব্যাহত।

ডাইনি নামে অভিযুক্ত নারীরা ছোট ছেলেমেয়েদের রক্ত চুষে খেতে ভালবাসে। নারীর বিরুদ্ধে এহেন অপবাদ অত্যন্ত লজ্জাজনক। সমাজপতিরা অশিক্ষিত নারীদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে তাকে হত্যা করে। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন — 'যে স্ত্রীলোককে ডাইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইত, গোড়া হইতেই তাহাকে পাপী সাব্যস্ত করা হইত। তারপর একটি বদ্ধ কারাকক্ষে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া পাপ স্বীকারের জন্য চলিত নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং ঘৃণিত বিচার প্রহসন। অবশেষে শাসিত দাতাদের হর্ষধ্বনির মধ্যে বেচারীকে টানিয়া বধ্যস্থানে লইয়া যাওয়া হইত। বলপূর্বক অগ্নিদাহের যন্ত্রণার মধ্যে তাহার সান্ত্বনা থাকিত শুধু দর্শকবৃন্দের আশ্বাস যে, মৃত্যুর পর অনন্ত নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার আত্মার ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে ভীষণতর কষ্ট লেখা আছে, বর্তমান কষ্ট শুধু তাহার একটি সামান্য নিদর্শন।' (স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১) এই ধরনের নারীদের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তারা অনায়াসেই হস্তগত করে নেয়। যে নারীকে সমাজ ডাইনি বলে প্রতিপন্ন করে, তাকে তার পরিবার থেকে পৃথক করে গ্রামের এক প্রান্তে শ্মশানের নিকটবর্তী স্থানে বাস করতে বাধ্য করা হয়। এভাবে তাদের জীবন বিপন্ন করে কেবল মানসিক নয়, তাদের বুকে পেটে ছুরি মেরে শারীরিকভাবেও প্রহার করা হয়। ধীরে ধীরে নিরুপায় হয়ে সেই নারীরাও নিজেকে ডাইনি ভাবতে শুরু করে। সমাজের এই অমানবিক ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরোধিতা করতে তারা অপারগ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষাও কুসংস্কার অধিকতর ক্ষতিকারক। ডাইনি প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হলেও এখনও বিভিন্ন স্থানে বজায় রয়েছে। এই বিষয়ে কঠোর প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থা করা এবং সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ : ১. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদনা), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, দে বুক স্টোর, কল-৭৩, ৩য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬।

২. সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদনা), জেন্ডার বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন, ঢাকা - ১১০০, ২য় মুদ্রণ ২০১২।

৩. শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, কল-৯, ৭ম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৯।

৪. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ১ম খণ্ড, সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লি-১১০০০১, ৯ম মুদ্রণ, ২০১৬।

৫. কমল চৌধুরী (সম্পাদনা), ডাইনি, দেজ পাবলিশিং, কল-৭৩, ১ম প্রকাশ, জানু.২০০৩।

৬. হুমায়ুন আজাদ, নারী, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১১।

৭. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ২২তম পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৩

পুস্তক পর্যালোচনা

গণমিত্র

স্বপ্নময় চক্রবর্তী।

প্রকাশক - মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স

দাম - ৩০০ টাকা

তা বছর চল্লিশ ও তার আগের কথা। ডাক্তারবাবুরা রোগ সারাতেন। নাড়ি টিপে, বুকে নল ঠেকিয়ে, শরীরের বিভিন্ন অংশে ঠোকাঠুকি করে তাঁরা চামড়ার নীচের খবরের হদিশ পেতেন। তার জন্য দামি পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন বড়ো একটা হত না। তাঁরা কখনো কখনো পরিবারের অভিভাবক হয়ে উঠতেন। জাঁক করে রোগীর পরিবার তাঁদের বলতেন হাউস ফিজিশিয়ান। তারও আগে ছিল কবিরাজের কাল।

কাশী থেকে পাস করা আয়ুর্বেদাচার্য বরদাচরণ সেন ছিলেন কৃষ্ণনগরের মহারাজাদের পারিবারিক চিকিৎসক। রাজ আনুকূল্যে প্রাপ্ত জমিতেই তাঁর ভদ্রাসন 'বরদাবাস'। পুত্র কৃষ্ণকমল ও হৃদয়কমল দু'জনেই পিতার পাশে বসে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছেন। একসঙ্গে বসবাস, প্র্যাকটিশ। হৃদয়কমলের একমাত্র সন্তান কালীকিঙ্কর যখন জন্মাল, তখন তিনি প্রায় পৌঢ়। কনজেনিটাল সিফিলিস নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুটি বেশিদিন বাঁচে নি, তার অল্পদিন পরে হৃদয়কমলও মারা যান। ভাইয়ের অংশে ভাইপো কালীকিঙ্করের স্মৃতিতে তপশিলি জাতি-উপজাতি ছাত্রদের হস্টেল বানিয়ে ভ্রাতৃবধূকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন কৃষ্ণকমল। কৃষ্ণকমলের ছেলে দেবকিঙ্কর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে পারিবারিক ধারার অনুসারী হয়ে চেম্বার খুলে বসলেন। এ ব্যাপারে কৃষ্ণকমলের আন্তরিক সমর্থন ছিল, আয়ুর্বেদের সীমাবদ্ধতা তিনি বুঝতে পারছিলেন, এবং স্বপ্ন দেখেছিলেন, পুত্র দেবকিঙ্কর এই দুই ধারার মিলন ঘটাবেন। দেবকিঙ্কর আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার ছাত্র হলেও বাবার কাছ থেকে শেখা রোগনির্ণয় ও চিকিৎসাপদ্ধতির উত্তরাধিকার তাঁর মধ্যে ছিল। গরীব রোগীদের ফ্রি স্যাম্পলগুলো দিয়ে দিতেন। সবসময় কাজ না করলেও এদের প্লাসিবো এফেক্ট তো আছে। ওতে রোগী মনে জোর পায়। চেম্বার রং করান নি, ঝাঁ চকচকে করে তোলেন নি, পাছে রিক্সাওয়ালা ভ্যানওয়ালারা আসতে ভয় পায়। নেতা ডাক্তারদের চাপের মুখেও ফিজ বাড়ান নি, পাছে তাঁর রোগীদের অসুবিধা হয়। দুর্বৃত্ত নার্সিং হোম ও তার চালক দুর্বৃত্ত কমবয়সি সার্জেনের অপকর্মের বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করতে পিছিয়ে যান না। তাদের যূথবদ্ধ আক্রমণ, চরম হেনস্থার মুখেও নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন না। আবার সেই নার্সিংহোম যখন ভাঙচুর হয়, ডাক্তার মার খান, তখনও ওই ডাক্তার নিগ্রহের বিরুদ্ধে নিজের স্পষ্ট মতামত জানিয়ে প্রতিবাদ জানাতে ভোলেন না।

দেবকিঙ্করের দু'টি সন্তান। মেয়ে লীলাবতী বড়ো, গণিতের কৃতি গবেষক। ছেলে জীবককে ডাক্তার করতে চেয়েছিলেন, অন্তত সে যাতে পরিবারের ধারা বজায় রাখে। কিন্তু একাধিক বারের চেষ্টাতেও সে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করতে পারে না। দেবকিঙ্কর ছেলেকে সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন, যাতে সে আরো পড়াশোনা করে ভালো কলেজে স্থান পায়। ছেলের অত ধৈর্য ছিল না, সে বাজার থেকে দড়ি কিনে এনে বাবা-মাকে আত্মহত্যার ভয় দেখায়, যাতে বাবা তাকে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিতে বাধ্য হন। অগত্যা তাই করতে হয়, লোনও নিতে হয় সেজন্য। জীবকের আদর্শ তার বাবা নয়। তাঁর জীবনদর্শন হল 'সেটিং'। বাবাকে নিয়ে তার একফোঁটা গর্বও নেই, শ্রদ্ধাও নেই। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে কেমিস্ট্রি অনার্সের মেধাবী ছাত্র সনাতন থাকে কালীকিঙ্কর ছাত্রাবাসে। তার বাবার চিকিৎসা করাতে গিয়ে শেষে এইচআইভি ধরা পড়ে। সনাতনের পরিবার তার গ্রামে একঘরে হয়ে যায়। পরিচারিকা মায়ের রোজগার ও সেবায় কিছুদিন চলার পর সনাতনের বাবা মারা যান। এলাকার মানুষের ব্যবহারে তিতিবিরক্ত দুই যমজ বোন ইঁদুর মারা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। সনাতন এমএসসি পাস করে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-এ তখন পিএইচডি করছে। ওর এইচআইভি পজিটিভ অসহায় মা'কে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন দেবকিঙ্কর।

এরই মধ্যে মোটর সাইকেলের ধাক্কায় আহত এক মহিলাকে চিকিৎসার জন্য তাঁর চেম্বারে নিয়ে আসে কিছু লোক। জানা যায় মহিলার বাড়ি মাজদিয়ার প্রত্যন্ত এলাকায় হাড়িভাঙা গ্রামে। জমি কেনার প্রয়োজনে কৃষ্ণনগর এসেছিলেন। দেবকিঙ্কর জানতে পারলেন, মহিলা একাই থাকেন, ধাঙড় পরিবার, বলরামী সম্প্রদায়। স্বামী শ্বশুর মারা গিয়েছেন, উঁচু জাতের ছেলেদের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে কঠিন পরীক্ষায়

পাস করা একমাত্র ছেলে শ্রীমন্ত কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে। মা চাইছেন, ওই প্রত্যন্ত এলাকায় হাড়ি, মুচি, মেথরদের জন্য একটা হাসপাতাল বানাতে, শ্রীমন্ত ডাক্তার হয়ে এসে হাল ধরবে। চমকিত হন দেবকিঙ্কর। এত হতাশার বিপরীতে এত আলো বলাহাড়িদের গুরু বলরাম ছিলেন এক অর্থে নাস্তিক। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী সত্ত্বার কারণে তিনি অত্যাচারিত হয়েছিলেন। তাঁর অনুগামী চপলা হাড়ি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন। দারিদ্র্য অশিক্ষা জাতপাতের আগল ভেঙে মানুষের মতো মানুষ হয়েছে ছেলে। যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন দেবকিঙ্কর। টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্যও করলেন।

ছেলে জীবক ডাক্তার হয়েছে। কলকাতার এক নার্সিং হোমে জয়েন করেছে। এরই মধ্যে জীবকের মা হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছেলের নার্সিং হোমেই ডায়ালিসিস চলে। কিন্তু ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন সামলানো যায় না। ট্রান্সপ্ল্যান্ট দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

রোগীকে না জানিয়ে বা মৃতদেহের শরীর থেকে কিডনি সরানোর উপায় জীবকের অজানা নয়। কিন্তু বাদ সাধে মায়ের রক্তের গ্রুপ। ওই গ্রুপের দাতা খুঁজে বের করা বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মাতৃভক্তি দেখানো, এবং এই সুবাদে বাবাকে মায়ের প্রতি উদাসীন প্রমাণ করার সুযোগ ছাড়তে চায় না জীবক। ভাগ্যিস তার নিজের রক্তের গ্রুপ মায়ের সঙ্গে মেলেনি, মিললে কি হত ভেবে পায় না সে। হঠাৎই সনাতনের মায়ের রক্ত পরীক্ষা করে তার সঙ্গে জীবকের মায়ের গ্রুপ সহ বহু কিছু হুবহু মিলে যায়। যেন দুই বোন। মহিলা এইচআইভি পজিটিভ জানা সত্ত্বেও মরিয়া হয়ে ওঠে জীবক, এই কিডনি তার মায়ের জন্য তাকে পেতেই হবে। হাসপাতালের বস, বাবা, মা, আইনি বাধার পরোয়া না করে, ও সেটিং করতে নামে। কিন্তু মা ছেলের এত ভক্তি সহ্য না করতে পেরে প্রচুর ওষুধ খেয়ে চিরকালের জন্য জ্বালা জুড়োন।

মুনাফার জন্য ব্যবসায়ীদের লোলুপতা, এক শ্রেণীর চিকিৎসকের আত্মসম্মান ভুলে অসুস্থ এই দৌড়-এ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনার জন্য যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন, তাদের সঙ্গে যুক্ত হল আর একটি উদ্যোগ— হাড়িভাঙার আমাদের হাসপাতাল।

গণমিত্র-র কাহিনী চেনা ঘটনা থেকে ছাপার অক্ষরে লেখক সুন্দর গদ্যে ও অপূর্ব দক্ষতায় তুলে ধরেছেন সেকাল ও একালের চিকিৎসাব্যবস্থার বিবর্তন, যার পরতে পরতে সমাজদেহে বাসা বাঁধা রোগগুলিকেও চিহ্নিত করেছেন তিনি। বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের না-জানা কাহিনী, সর্বোপরি নৈতিকতার ধ্বস নামা সমাজের খাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাতে গোনা কয়েকজন চিকিৎসকের অসম লড়াই এক টানটান উত্তেজনা জাগিয়ে রাখে। ডাক্তার-রোগী সম্পর্কটা যখন তলানিতে তখন *গণমিত্র* একটা মানবিক ছবি পাঠকের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। তার দরকারও ছিল। বইটির প্রচ্ছদ বেশ, তবে প্রচুর বানান ভুল। দুর্বল প্রুফ রিডিং।

বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'মানবকল্যাণে সমর্পিত ডাক্তারবাবুদের উদ্দেশ্যে'— তাই কোথায় যেন একটু ফাঁক রয়ে গেল। উপন্যাসের গণমিত্ররা প্রধানত চাকরিজীবী ও চেম্বারে প্র্যাকটিস করা ডাক্তার। সাধারণ মানুষের কাছে কর্পোরেট চিকিৎসা তো ধরাছোঁয়ার বাইরে। জরুরি প্রয়োজনে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ মেলে না। জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন এমন জনাকয়েক পোড়খাওয়া হোলটাইমার ডাক্তারের উদ্যোগে এ রাজ্যে ছোটবড় বেশ কয়েকটি বিকল্প চিকিৎসাকেন্দ্রে গড়ে উঠেছে, যেখানে সুলভে যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসা মেলে। ওই অ্যাক্টিভিস্ট ডাক্তাররা মাটি কামড়ে পড়ে আছেন বলেই সেগুলি চলছে। তাছাড়া তাঁরা নতুন প্রজন্মের কিছু ডাক্তারকে এই উদ্যোগে সামিল করতে পেরেছেন। আশার কথা জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের ঝান্ডা ধরে রাখার মতো কিছু ডাক্তার তৈরি আছেন। এই দিকটা *গণমিত্র*-তে উপেক্ষিত। লেখক যে সেইসব ডাক্তারদের খোঁজ রাখেন না উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি দেখে তা মনে হল না।

শর্মিষ্ঠা রায়

উ মা

লেখকদের প্রতি

উৎস মানুষ পত্রিকায় যে কেউ লেখা দিতে পারেন। যাঁরা প্রথম লেখা দেবেন অথচ উ.মা. কখনও পড়েননি তাঁরা পত্রিকার ওয়েবসাইটে www.utsomanush.com গিয়ে পুরোনো সংখ্যাগুলো পড়ে নেবেন। উ.মা. পত্রিকায় কী ধরনের লেখা বেরোয় তা বোঝার এটিই সহজতম উপায়। সর্বাধিক ১২০০ শব্দের ভেতর লেখা দিতে পারেন। সেইসঙ্গে লেখায় ব্যবহৃত তথ্য বা উদ্ধৃতির সমর্থনে সঠিক সূত্র-র উল্লেখ থাকতে হবে। নইলে লেখা বাতিল বলে গণ্য করা হবে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফোনে যোগাযোগ না করাই ভালো। পত্রিকার ইমেইলে utsamanush1980@gmail.com ইউনিকোডে লেখা পাঠাবেন, সঙ্গে ওয়ার্ড ফাইলটিও পাঠাতে হবে। লেখা মনোনীত হলে লেখকের ইমেইলে তা জানানো হবে। তা না হলে লেখাটি মনোনীত হয়নি বলে ধরে নিতে হবে। লেখার সঙ্গে ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ইমেইল দিয়ে দেবেন। — উ.মা. পরিচালকমণ্ডলী

প্রতিবেদন

স্মরণে সুনন্দ সান্যাল

বিগত ৪ঠা এপ্রিল ২০২২ গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের শিবানন্দ সভাঘরে একটি সুন্দর সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সুনন্দ সান্যালের ছাত্র ও বিশিষ্টজনের স্মৃতিচারণায় তাঁর জীবন ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন অনালোচিত দিক উঠে আসে। যা পরিপূর্ণ সভাঘরে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। অধ্যাপক সুনন্দ সান্যালের জন্ম ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪ এবং মৃত্যু ২২ মার্চ, ২০২২। তাঁর একমাত্র পুত্র সুগত সান্যাল অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলকে স্বাগত জানান এবং ধন্যবাদ জানান রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষকে সভার আয়োজনে সবরকম সহায়তা করার জন্যে। শুরুতে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রণানন্দ মহারাজ এই বিদ্যামন্দিরে সুনন্দ সান্যালের কর্মজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। স্বামীজী একসময় সুনন্দ সান্যালের ছাত্র ছিলেন, সেই সূত্রে তাঁর প্রিয় শিক্ষকের ক্লাসে অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের কর্মাধ্যক্ষ স্বামী সুপূর্ণানন্দ মহারাজ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সুনন্দ সান্যাল সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে শিক্ষকতায় নিবেদিত প্রাণ, সমাজ সচেতন ও অত্যন্ত সংবেদনশীল একজন মানুষ সুনন্দ সান্যাল, যিনি মিশনের যে কোনো প্রয়োজনে সাহায্য করেছেন। তাঁর পুত্র সুগত সান্যালের আন্তরিক ইচ্ছায় আমরা মিশনের সভাঘরে এই স্মরণ-অনুষ্ঠান আয়োজনে যুক্ত হতে পেরেছি, যা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে ভবিষ্যতে স্মরণে রাখব। অধ্যাপক তথাগত রায়, প্রাক্তন রাজ্যপাল ত্রিপুরা ও মেঘালয়, হঠাৎই অনুষ্ঠানে এসে হাজির। সভামুখ্য অধ্যাপক পুলকনারায়ণ ধর তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। অধ্যাপক রায় তাঁর সংক্ষেপিত ভাষণে বলেন যে, সংবাদপত্রে অনুষ্ঠানের খবর দেখে এসেছেন এমন একজন নির্ভীক মানুষকে শ্রদ্ধা জানাতে যিনি আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং সেই কারণে তাঁকে নিগৃহীতও হতে হয়েছে। স্বল্প পরিচয়ে দেখেছি তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় মানসিকতা, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত সকলকে একটি ছোট পুস্তিকা— 'অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল স্মরণে' দেওয়া হয়, যেখানে সুগত সান্যাল, নন্দিতা মৈত্র, মানস ঘোষ এবং পুলকনারায়ণ ধর অত্যন্ত আন্তরিকতায় তাঁদের স্মৃতিচারণা করেছেন। অধ্যাপক ধর তাঁর লিখিত রচনাটি অত্যন্ত আবেগের সাথে পাঠ করেন। তার কিছুটা অংশ মর্মস্পর্শী। তিনি বলেছেন — 'সুনন্দবাবু ছিলেন গভীর ছাত্রদরদী শিক্ষক। শিক্ষক আন্দোলন বলতে সাধারণত যা বোঝায় তিনি সেভাবে কখনো কারোও পতাকার নীচে এসে দাঁড়াননি। কিন্তু সার্বিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার কী উন্নতি সাধন করা যায়, বিশেষত শিশু শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ভাবনা ছিল মূল্যবান। এই ভাবনা এবং বাঙালির উন্নতি প্রসঙ্গেই তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে 'ইংরাজি' ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিশেষ করে *The Statesman* কাগজে দিনের পর দিন নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর বিদগ্ধ রচনাগুলির যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।' আরও বলেছেন, 'ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত নিপাট বাঙালি সুভদ্র লোকটিকে অনেকে উপহাস করলেও বাঙলার বহু সাধারণ মানুষ এই 'দলহীন' মানুষটির মধ্যেই যেন তাদের 'বিবেক' বা আত্মাকে খুঁজে পেয়েছিল। এরই ফলে তৈরি হল 'গণমুক্তি পরিষদ' নামক সিভিল সোসাইটি-র সংগঠন। নামকরণ করেছেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত।' এই সংগঠনই পরবর্তীকালে বহুমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সুনন্দ সান্যাল চেয়েছিলেন, 'বাঙালির ধ্বস্ত মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে।' তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ডের আরেকটি দিক তুলে ধরেন ড. কিসানলাল প্রধান, সম্পাদক,The Calcutta Heart Clinic & Hospital Society (CHCHS), Salt Lake, যার সহ সভাপতি ছিলেন সুনন্দ সান্যাল। ড. প্রধান জানালেন যে হাসপাতালের উন্নতিকল্পে সুনন্দ সান্যালের অবদান অপরিসীম, তাঁর মৃত্যু আমাদের এক অপূরণীয় ক্ষতি। সুনন্দবাবুর কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ছাত্ররা তাদের প্রিয় শিক্ষকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী তার সাংবাদিকতার জীবনে সুনন্দবাবুর সান্নিধ্য এবং তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তা উল্লেখ করেন। বিভিন্নজনের আলোচনায় সুনন্দবাবুর 'বৌদ্ধিক নিরপেক্ষতা'র প্রসঙ্গ উঠে আসে, তাই অধ্যাপিকা নন্দিতা মৈত্র লিখেছেন— 'হে সুনন্দ! রবে চিরদিন।/তোমার চিত্র হবে না মলিন!/ প্রদীপ নিভে গেলেও তবু,/হয়না আলোর শেষ।/ মানুষের মনে যেন থেকে যায়.../সেই আলোটার রেশ।'

পুস্তিকাটিতে সুগত সান্যাল তাঁর বাবার সম্পর্কে অতি সুন্দর মূল্যায়ন করেছেন। যেমন — 'সুনন্দ এক গভীর ও দরদী মনের মানুষ। অর্থ, ক্ষমতা বা খ্যাতি কখনই আকর্ষণ করেনি। সমাজের মঙ্গল ও সুন্দর এক প্রজন্মের স্বপ্ন ছাড়া তাঁর জীবনে আর কোনো চাহিদা ছিল না।'

সভা শেষে সুগত সান্যাল সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে শীঘ্রই একটি ওয়েসাইট চালু করা হবে যেখানে সুনন্দ সান্যালের লেখা, সংশ্লিষ্ট তথ্য ইত্যাদি থাকবে এবং রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে সুনন্দ সান্যাল নামাঙ্কিত একটি অধ্যাপক পদ করা হবে।

শ্যামল ভদ্র

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00
৪২ বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/
৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ---হারিত বুকস (অনলাইন)
haritbooks@gmail.com
হারিতের ফোন নং — ৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়।
Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0008320
বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী	২৫০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১০০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১০০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক:	
রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা, দুপুর ৩টে-সন্ধ্যে ৭টা), পাতিরাম, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন।